উনিশে নরেন্দ্র মোদীকে হারাতে এক মঞ্চে ভারত বিরোধী সমস্ত শক্তি — পৃঃ ১০

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

আপনি পিঁপড়ের মতো পিষে ফেলতে পারবেন না —পৃঃ ১৩

৭১ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ১৫ অক্টোবর ২০১৮।। ২৮ আশ্বিন - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com



স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ২৮ আশ্বিন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৫ অক্টোবর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

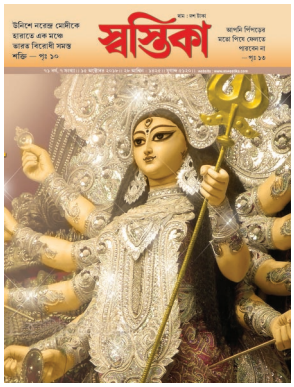

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

মমতার মহাজোট হচ্ছে না পাঁচ রাজ্যের ভোটে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ৬

খোলা চিঠি : মদে-ভাতে রেখো মা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

মুসলমান চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর চীন ▯ এরিক স্কুজেল ▯ ৮

উনিশে নরেন্দ্র মোদীকে হারাতে এক মঞ্চে ভারতবিরোধী সমস্ত শক্তি ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১০

আপনি পিঁপড়ের মতো পিষে ফেলতে পারবেন না ▯ ড. জিষ্ণু বসু ▯ ১৩

হিন্দু : এক বিপন্ন জাতিসত্তা ▯ রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৫

সপ্তমীর দুপুরে হেমন্তের ব্যারিটোন ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৯

পুজোর ক'দিন বাঙ্গালি খাবার ▯ নীলাঞ্জনা রায় ▯ ২১

দুর্গাপুজোয় মেয়েরা বড়ো ভূমিকা পালন করে থাকে ▯ গার্গী মণ্ডল ▯ ২২

প্রবাসে দুর্গাপূজা মানে শিকড়ের সঙ্গে পরিচয় ▯ সারদা সরকার ▯ ২৩

দুর্গাপূজা দেশ থেকে দূরে থাকার দুঃখ ভুলিয়ে দেয় ▯ নিলয় নাথ ▯ ২৪

প্রবাসী জীবনে দুর্গাপূজা যেন এক পরম প্রাপ্তি ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ২৫

দুর্গাপুজোয় নারীশক্তির আরাধনা ▯ লকেট চট্টোপাধ্যায় ▯ ২৬

নারী শক্তিরূপিণী ▯ দেবযানী ভট্টাচার্য ▯ ২৭

পুঞ্জীভূত মাতৃভাবময়ী দেবীদুর্গা ▯ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৯

পশ্চিমের চাপে ভারতীয় পোশাক বিপন্ন নয় ▯ অগ্নিমিত্রা পল ▯ ৩০

দু'শো আটান্ন বছরের অভয়া দুর্গা ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩১

পটুয়াটোলার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গোৎসব ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩২

দেশে দেশে মা দুর্গা ▯ দিলীপ পাল ▯ ৩৪

গল্প : বড়দের রূপকথা ▯ নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায় ▯ ৩৫

সোনার মেয়েরা ▯ যদুনাথ ভট্ট ▯ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৭-১৮ ▯ **অঙ্গনা : ৩৯** ▯

নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ **সুস্বাস্থ্য : ৪২** ▯ **খেলা : ৪৪** ▯

স্মরণে : ৪৫ ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

পূজাবকাশের ২২ ও ২৯ অক্টোবর স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে না। ৫ নভেম্বর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

— স্বঃ সঃ

প্রকাশিত হবে
৫ নভেম্বর ২০১৮

স্বস্তিকা

শুভ দীপাবলী

প্রকাশিত হবে
৫ নভেম্বর ২০১৮

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা (৫.১১.১৮) দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা। যুগযুগান্ত ধরে বঙ্গদেশ মহাশক্তির সাধনভূমি হিসেবে পরিচিত। কালীপূজা হিন্দু বাঙ্গালির একটি প্রধান ধর্মীয় উৎসব। স্বস্তিকার দীপাবলী সংখ্যায় থাকবে মহাশক্তি এবং শক্তিসাধকদের নিয়ে উপভোগ্য কয়েকটি রচনা। লিখবেন অরুণ মুখোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন সেন, পুলকনারায়ণ ধর প্রমুখ।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার



SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথম যে শব্দটি তাহার মুখ হইতে বাহির হয়, তাহা হইল—'মা'। এই একটি শব্দের ভিতর বিশ্বের যত আকুতি, যত আদর-আবদার-অভিমান—সব কিছুই মিশ্রিত রহিয়াছে। মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কটিই হইল পৃথিবীর পবিত্রতম সম্পর্ক। দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিবার পর সন্তান যখন পৃথিবীর আলো দেখে, তখন হইতেই জননী তাহাকে নিবিড় স্নেহচ্ছায়ায় প্রতিপালন করেন। একটি চারাগাছকে যেমন পরম যত্নে মালী বড় করিয়া তোলে, তেমনই সন্তানকেও জননী পরিচর্যা দিয়া জীবনসংগ্রামের পথে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলেন। দেবীপক্ষ এই চিরন্তন জননীকেই আবাহন করিবার, আরাধনা করিবার পর্ব। বাংলার ঘরে ঘরে, বাঙ্গালির ঘরে ঘরে দেবী দুর্গা চিরকাল পূজিতা হইয়াছেন কখনও স্নেহশীলা জননী রূপে, আবার কখনও বা কন্যা রূপে। জননী এবং কন্যা—দুই রূপেই তাঁহাকে কল্পনা করিতে আমরা ভালোবাসিয়াছি। সন্তানের সঙ্গে মায়ের যেমন অকৃত্রিম নাড়ির সম্পর্ক—দেবী দুর্গার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটি অনুরূপ। অথবা, স্নেহের কন্যাটির সঙ্গে তাঁহার পিতা-মাতার যেমন স্নেহের বন্ধন—দেবী দুর্গার সঙ্গেও যেন আমাদের বন্ধনটি অনুরূপ। বাঙালির কল্পনায় আশ্বিনের এই শারদপ্রাতে তিনটি দিবসের জন্য উমা পুত্র-কন্যা সমেত পিত্রালয়ে আসেন। সংবৎসর এই তিনটি দিবসের জন্য আমাদের যাবতীয় অপেক্ষা।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে দেবীর তিনটি রূপের বর্ণনা রহিয়াছে। প্রথম রূপটি—মা যা ছিলেন। দ্বিতীয় রূপটি—মা যা হইয়াছেন। তৃতীয় রূপটি—মা যা হইবেন। এই তৃতীয় রূপেই দেবী দুর্গা প্রস্ফুটিত। সালংকরা, অসুরদলনী এক মাতৃমূর্তি। অশুভকে বিনাশ করিয়া যিনি শুভকে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই মাতৃমূর্তিকে নিছক মৃন্ময়ী মূর্তি রূপে কল্পনা করেন নাই। বরং এই মাতৃমূর্তির ভিতর দিয়া তিনি দেশজননীকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেশমাতৃকার বন্দনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী।' স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই অগ্নিঝরা দিনগুলিতে বাংলার বিপ্লবীরাও দেবী দুর্গার ভিতরই দেশজননীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেবীর আরাধনা করিয়া দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে তাঁহারা ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রও রাবণরূপী দুষ্ট শক্তিকে দমন করিবার নিমিত্ত শরৎকালে এই মাতৃ আরাধনা করিয়াছিলেন। কাজেই দেবী দুর্গা 'মাতৃরূপেণ'-র পাশাপাশি চিরকালই 'শক্তিরূপেণ'ও সংস্থিতা।

মহাপূজার কাল আর একবার সমাসন্ন। সালংকারা অসুরদলনী জননী দুর্গা আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বরণ করিব, তাঁহার আরাধনা করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—অসুর দলনী জননীর কাছে আমাদের প্রার্থনা যেন নিতান্তই ব্যক্তিগত সুখের প্রার্থনা না হয়। বরং আমরা যেন জননীর কাছে শক্তি প্রার্থনা করি। কহিতে পারি—অন্তরে শক্তি দাও, দেহে শক্তি দাও। যেন সমস্ত অশুভের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা জয়ী হইতে পারি। অবলা কেন মা এত বলে—এই আক্ষেপ যেন আর কখনো আমাদের করিতে না হয়।

সুভাষিতম্

অহো বৎ বিচিত্রাণি চরিত্রাণি মহাত্মানং।
লক্ষ্মীং তৃণ্যা মন্যন্তে তৎভারেণ নমন্তি যৎ।। (চাণক্যনীতি)

মহৎ ব্যক্তিদের আচরণ কী বিস্ময়কর। ধনসম্পদকে তাঁরা তৃণবৎ জ্ঞান করেন। কিন্তু একে তাঁরা দায়ভার হিসেবে গ্রহণ করেন।

মমতার মহাজোট হচ্ছে না পাঁচ রাজ্যের ভোটে

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সবে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল দল গড়ে বাম বিরোধী নেত্রী হয়েছেন। কলকাতার বড় বড় মিডিয়ার তাবড় তাবড় সাংবাদিক গুরুরা সকলেই এক বাক্যে বলেছিলেন, কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল গড়ে কেউ সাফল্য পাননি। মমতাও সফল হবেন না। সাংবাদিকদের ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ হয়েছিল। মমতা বাম বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। রাজ্যে ক্ষমতা দখলের প্রথম দফায় তৃণমূল নেত্রীর রাজনৈতিক চরিত্র বদল তেমন একটা হয়নি। যে মাওবাদীদের নিয়ে তিনি সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে সিপিএমকে উৎখাত করেছিলেন পরে সেই মাওবাদীদের পুলিশ দিয়ে খুন করান। জঙ্গলমহল থেকে মাওবাদীদের তাড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন জঙ্গলমহল এখন হাসছে। চামচা সাংবাদিকরা প্রচারের দামামা বাজিয়ে বলে দিলেন সেখানকার জনজাতি সমাজের সমস্ত চাহিদা দিদি পূরণ করেছেন। অর্থাৎ জনজাতিদের সকলকে দু'টাকা কিলো চাল দেওয়াটাই যেন তাঁদের একমাত্র চাহিদা বা দাবি ছিল। জনজাতিদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কতটা দৃষ্টি দিয়েছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী? দেননি। আজ জঙ্গলমহলে তাই তৃণমূল ব্যাকফুটে।

পুজো আর দেওয়ালির উৎসব মিটলেই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার ভোট শুরু হবে। ১২ নভেম্বর থেকে টানা ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রথম দফায় ছত্তিশগড়ের ১৮টি আসনে ভোট দিয়ে শুরু হবে এক মাসের ভোট পর্ব। বাকি ৭২টি মাওবাদী-প্রভাবিত আসনে ভোট হবে ২০ নভেম্বর। একমাত্র ছত্তিশগড়ে দুই দফায় ভোট হবে। বাকি চারটি রাজ্যে ভোট নেওয়া হবে এক দফায়। যেমন, বিজেপি শাসিত রাজ্য— মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের মতো বড়ো রাজ্যে ভোট হবে এক দফায়। কারণ, এই দুই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা নেই। মিজোরাম ও তেলেঙ্গানা ছোট রাজ্য। সেখানে এক

গূঢ় পুরুষের

কলম

দফায় ভোট। এবার বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ের ভোট। এখানে টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় আছে বিজেপি। এখানে টক্কর কংগ্রেসের সঙ্গে। লোকসভা ভোটের আগে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে যদি বিজেপি তার দুর্গ অক্ষত রাখতে পারে তবে নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রিত্ব কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু ভুললে চলবে না যে সাম্প্রতিককালে রাজস্থানে বিধানসভার ২২টি উপনির্বাচনের মধ্যে ২১টিতে বিজেপি প্রার্থী হেরেছেন। সেখানে প্রতিষ্ঠান বিরোধী প্রবল হাওয়ার মোকাবিলা করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের পক্ষে জাঠ এবং মাড়োয়ারি ভোট ব্যাঙ্ক ফিরে পাওয়া কঠিন। কারণ, তাঁর ব্যক্তিগত প্রবল ইগো। তাঁর রাজ পরিবারের ঘরানা বা আভিজাত্য বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একইভাবে মধ্যপ্রদেশে কৃষকদের বিক্ষোভ বিজেপিকে চিন্তায় রেখেছে। বিজেপির নিজস্ব দলীয় সমীক্ষাই বলছে, এবার রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে কঠিন লড়াই হতে চলেছে। তবে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার ভোটের আগে বিজেপি বিরোধী জোট হচ্ছে না। কংগ্রেস, এসপি, বিএসপি সকলেই একক দলীয় শক্তিতে লড়ছে। ভোট ভাগাভাগিতে লাভবান হবে বিজেপি।

দেশের পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি বিরোধী মহাজোট না হওয়ায় মর্মাহত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের প্রধান আঞ্চলিক দলগুলির নেতৃত্ব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা কংগ্রেসকে জোটের বাইরে রাখতে চায়। কারণ, কংগ্রেসের রাজনীতি দেশের মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। সপার অখিলেশ যাদব এবং বিএসপি-র মায়াবতী বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁদের দল কংগ্রেসের সঙ্গে আসনরফায় যাবে না। বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী সর্বপ্রথম বিজেপি বিরোধী মহাজোটের ডাক দিয়েছিলেন। সেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে লোকসভার ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস কোনও দলের সঙ্গেই আসন রফা করবে না। তারা নিজস্ব দলীয় শক্তিতে ৪২টি আসনেই প্রার্থী দেবে। পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভার ভোটের ফল কী হবে জানি না। তবে মমতার স্বপ্নের মহাজোট বা ফেডারেল ফ্রন্ট যে ২০১৯-এর ভোটে হচ্ছে না তা এখনই বলে দেওয়া যায়। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

মদে-ভাতে রেখো মা

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
নবান্ন, হাওড়া

শারদীয় বাংলায় দিদি আপনাকে মদীয় শুভেচ্ছা। মদ বেচবে সরকার, চাট মিলবে রেশন দোকানে। এল এক সুখের লগন। দুর্গামায়ের কাছে আমার প্রার্থনা— আমার সন্ততি যেন থাকে 'মদে-ভাতে'। কারণ, সেই 'মদে-ভাতে' থাকাতেই যে 'সোনার বাংলা'রটিকে থাকার স্বপ্ন। আপনারা নয়া নীতিতে তো মদ-বিরোধিতা মানে রাষ্ট্রদ্রোহিতা।

দিদি আপনি বদলের প্রতীক। সময় বদলায়। স্লোগান বদলায়। প্রার্থনাও বদলায়। 'ঢুক ঢুক পিও, যুগ যুগ জিও', দেদার মদের দোকানের লাইসেন্স দেওয়া নিয়ে বাম সরকারের বিরুদ্ধে এমনই স্লোগান ছিল আপনার। কিন্তু ক্ষমতায় এসে আপনি বুঝেছেন, মদ বিক্রিই টিকে থাকার বড় উপায়। প্রায় শিল্পহীন রাজ্যে বড় আয়ের উৎস মদ বিক্রির রাজস্ব। সেই লক্ষ্যে আগেই বাংলা মদকে ব্র্যান্ডের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন আকর্ষণীয় নামে বাংলা মদের বিজ্ঞাপন দিয়ে সাফল্যও পেয়েছে আপনার সরকার। এবার 'দিশি-বিদেশি' সব মদের সরকারি দোকান খোলার উদ্যোগ।

ধাপে ধাপে এগিয়েছে আপনার সরকার। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত--- জেলায় জেলায় মদের দোকান খুলবে রাজ্য সরকার। সোজা কথা— আয় বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। বিরোধীরা কী বলছেন সেটা বড়ো কথা নয়, টিকে থাকার এই লড়াইটাই বড় কথা। সমকামিতা, পরকীয়া সুপ্রিম স্বাধীনতা পেয়েছে। দ্রুত বড়ো হয়ে ওঠা ভারতের এই অঙ্গ রাজ্য আরও বড়ো হয়ে উঠল। এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে 'বাংলা' হতে চলা রাজ্যের মানুষ গ্লাস হাতে দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পারবে— 'বাংলা আমার তৃষ্ণার জল, রিক্ত শেষ চুমুক...।'

বছর কয়েক আগের এক সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে— বছরে গড়ে ২০ কোটি বোতল বিয়ার বিক্রি হয় বঙ্গে। বিদেশি মদের বিক্রি আনুমানিক ৩৫ কোটি বোতল। আর বছরে দেশি মদের বোতল বিক্রি হয় ৯৬ কোটি। এর পরে তা বেড়েছে। বেড়েই চলেছে। তাইতো ২০১৬ সালের দুর্গাপুজো থেকেই পুজোর সবদিন মদের দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় রাজ্য সরকার। আগে নিয়ম ছিল পুজোর মধ্যে দু'দিন মদের দোকান বন্ধ। দেখা গিয়েছিল—যারা কেনার তারা আগেই স্টক করছেন। আর স্টক করা না থাকলে ব্ল্যাকে কিনছেন। তবে আর বন্ধ করে রেখে শুধু শুধু আয় কমানো কেন? সেই বছরই তারাপীঠে সারারাত মদের দোকান খুলে রেখে সাফল্য পায় রাজ্য। এক জায়গাতেই দু'রাতে সাড়ে তিন কোটির মদ বেচে আর পিছন ফিরে তাকায়নি সরকার। পুজোয় চারদিন চুটিয়ে মদ কেনার সুযোগ এখন বঙ্গে।

২০১৬ সালের ডিসেম্বরে বড় সিদ্ধান্ত। আপনার সরকার ভেঙে দেয় আবগারি ডিরেক্টরেট। তৈরি করা হয় নতুন একটি আবগারি নিগম। দিশি-বিলিতি সব ধরনের মদের পাইকারি বিক্রির নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয় সরকার। এর পরে বড় পদক্ষেপটি হয় ২০১৭ সালে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ সচিবের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আবগারি দপ্তরের অধীনে একটি কোম্পানির মাধ্যমে এবার থেকে মদ বিক্রির ব্যবস্থা হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট বেভারেজ কর্পোরেশন নামে একটি কোম্পানি খোলা হচ্ছে।

২০১৭ সালের ১ জুলাই। যেদিন গোটা দেশে জিএসটি চাল হলো সেদিন থেকেই মদের পাইকারি ব্যবসার একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণও হাতে নিয়ে নেয় দিদি আপনার সরকার। বিলিতি মদ এবং বিদেশ থেকে আমদানি করা মদের পুরো নিয়ন্ত্রণও এখন আপনার হাতে। উৎপাদক বা আমদানিকারী সংস্থার থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে যে কোনও ধরনের মদ যায় আবগারি দপ্তরের গুদামে। সেখান থেকে সরকার খুচরো ব্যবসায়ীদের সরাসরি বিক্রি করে। তারপর থেকেই, রাজ্যে খুচরো দোকানে সরকারি ছাপওয়ালা মদ না-থাকলে তা বেআইনি। এবার আরও পাকা সিলমোহর। সরকারি দোকানে সরকারি মদ।

বাকি রইল চাট। ইতিমধ্যেই রাজ্যের রেশন দোকানকে 'মিনি মল' বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। যেখানে ২ টাকা কেজির চাল, সেখানেই ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট। মুচমুচে, ঝালঝাল, টক-ঝাল-মিষ্টি সব মিলছে।

এবার দিদি আপনার স্লোগান হোক---মদই আমাদের ভিত্তি, মদই আমাদের ভবিষ্যৎ।

—সুন্দর মৌলিক

মুসলমান চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর চীন

অতিথি কলম



এরিক স্কুজেল

সাময়িক বন্দিশিবিরগুলিতে বিশেষত উইঘুর ও অন্য সম্প্রদায়ের মুসলমানদের নতুনভাবে তথাকথিত 'সুস্থ' করে তোলার নামে তাদের ধর্মই পাল্টে দেওয়ার মহড়া শুরু হয়েছে।

মুসলমানদের ওপর চীনের নির্যাতন সম্প্রতি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। সেদেশে পুর্ণশিক্ষাদান নামে এক পদ্ধতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট মুসলমান শিবিরের বাসিন্দাদের প্রায় একঘরে করে ফেলা হয়েছে। এই বন্দিরা 'সুস্থ' হওয়ার যোগ্য এই সাঙ্কেতিক নামের দ্বারা আসলে তাদের ধর্ম পরিবর্তনের প্রক্রিয়াই শুরু হয়েছে। চীনের ঝিংজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী উইঘুর ও কাজাকিস্থান থেকে আসা মুসলমানরা তাদের বসবাসের অঞ্চলটিকে 'পূর্ব তুর্কিস্থান' বলে পরিচয় দিচ্ছে। অপরদিকে চীনের কর্তারা তাদের দেশের নিরাপত্তার খাতিরে এই মুসলমান চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বদ্ধপরিকর। বাস্তবে এই নিরাপত্তার বকলমে মুসলমান ও অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্বিচার নিধন চলছে।

১৯৯৯ সালে চীন 'পশ্চিম দুয়ার খুলে দাও' নীতি গ্রহণ করার পর কুখ্যাত নির্দিষ্ট সংখ্যার পুঁজিপতিদের মধ্যে আবর্তিত (Crony Capitalism) এর সমস্ত লক্ষণই সেদেশের অর্থনীতিতে ফুটে উঠতে থাকে। চীনের পশ্চিমপ্রান্তে ক্রমিক অস্থিরতার সঙ্গে যোগ হয় চীনের ভূ-অর্থনৈতিক কৌশল (আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতি) ও বেড়ে চলা জাতীয়তাবাদ। দলের একচ্ছত্র আধিপত্যবাদ বরাবরই বজায় থাকায় এই ঝিংজিয়াং প্রদেশে একটি বিষম সমাজ বেড়ে উঠতে থাকে। এই সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জাতিভিত্তিক বৈষম্য ও তাদের ওপর বৈজ্ঞানিকভাবে সর্বোচ্চ প্রযুক্তির নজরদারি চালানো।

জননিরপাত্তা রক্ষার দোহাই দিয়ে বিপুল খরচ বেড়ে যাওয়াকে মান্যতা দিতে চীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানোর তীব্রতাকে কিছুটা আড়ালে রাখতে চায়। জনৈক অধিকর্তা সম্প্রতি বলেই ফেলেছেন যে ঝিংজিয়াং প্রদেশ যাতে জঙ্গিদের হাতে 'চীনের সিরিয়া' না হয়ে ওঠে সেই জন্যেই দমন পীড়নের দাওয়াই শুরু করা হয়েছে। এই ধরনের উচ্চমার্গীয় বাণীর মাধ্যমে চীন অতীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও মার্কিনি সমর্থন আদায় করতে পেরেছিল। কিন্তু ব্যাপক ধরপাকড় ও জেলে পোরার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার ফলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি নড়ে চড়ে বসছে।

ঝিংজিয়াংয়ে গ্রেপ্তার হয়ে ক্যাম্পে চালান হয়েছে ১০ লক্ষ মুসলমান। এদের অধিকাংশই উইঘুর ও কাজাক সম্প্রদায়ের। খবর পাওয়া যাচ্ছে আরও অজস্র নিখোঁজ হয়ে গেছে। বন্দি হওয়া ও নতুন করে শিক্ষা নেওয়ার জন্য চিহ্নিত অধিকাংশ লোকই সাধারণ উইঘুর সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু এর মধ্যে থেকে কিছু যাকে বলে হাই প্রোফাইল কেস তার খবরও পাওয়া গেছে। একজন স্বনামধন্য উইঘুর প্রত্নতত্ত্ববিদ ও তাঁর সঙ্গী কিছু প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী যারা ক্যাম্পে ও বন্দিদশায় থাকা লোকজন, তারা বয়ান দেওয়া শুরু করেছে। পিপল্‌স্ রিপাবলিক অব চায়না (PRC)-র সরকারি দলিল দস্তাবেজ ও স্যাটেলাইটের ছবি থেকে বন্দিশিবির ও ক্যাম্পগুলিতে মানুষজনকে নিকেশ করে দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শুধু তাই নয়, এই দমন নিধন প্রক্রিয়া কতদূর যেতে পারে তারও প্রমাণ মিলেছে।

চীনের প্রতিনিধিরা অবশ্য এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছে— কিছু কিছু ইউঘুরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে আর কিছুকে ছুটকো-ছাটকা অপরাধের কারণে ধরা হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে অবশ্য নজর করা গেছে এই ধরনের তথাকথিত বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ছুরি গাঁথা তার দিয়ে ঘেরা। সেখানে রয়েছে প্রহরীসম্ভৃত উঁচু নিরীক্ষণ মিনার। অন্যদিকে সরকারি তথ্য অনুযায়ী অপরাধের সংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালে গোটা চীনে সাকুল্যে যত গ্রেপ্তারির ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে ২১ শতাংশই ঝিনজিয়াং প্রদেশে। অথচ মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.৫ শতাংশই এই অঞ্চলে বসবাস করে।

বিষয়টি নিয়ে বিশদে যেতে আন্তর্জাতিক দুনিয়া খুব একটা উৎসাহী নয়। কারণ অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা। তুরস্কের রাষ্ট্রপতি এন্ডোগান চীন প্রবাসী উল্লেখিত সুন্নি ইউঘুর মুসলমানদের স্বাভাবিক মিত্র হিসেবে গণ্য হন। একটা সময় তাদের ওপর চীনের দমন পীড়ন নিয়ে তিনি মুখ খুলেছিলেন। সরাসরি বলেছিলেন সেখানে গণহত্যা সংগঠিত হচ্ছে। কিন্তু আজকের তারিখে তুরস্ক চীনের সঙ্গে বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প নিয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক মজবুত করার রাস্তায় হাঁটছে। অন্য মুসলমান দুনিয়া বা আরব দেশগুলিও এ ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বনই শ্রেয় মনে করছে। কারণ সেই অর্থনীতি। এর পরিণতিতে প্রবাসী উইঘুররা চরম হতাশায় ভুগছে। কূটনৈতিক দুনিয়ার খবরাখবর রাখেন এমন বিশেষজ্ঞদের মুখে শোনা যায় যে চীনের সঙ্গে অন্য কোনও দেশের বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনার সময় যদি ঘুণাক্ষরেও এই ধরনের মুসলমান অধিকার হনন করার প্রসঙ্গ তোলা হয়,

সেক্ষেত্রে চুক্তির দফা রফা। আলোচনা আর ইতিবাচক পথে এগোবে না। মানব অধিকার বা ইত্যাকার কথাবার্তা বাইরে রেখেই অর্থনৈতিক চুক্তি সম্ভবপর, নচেৎ নয়।

এখন বিশ্বের অন্য বহু দেশেই এই উইঘুর বা কাজাক মুসলমানদের অভিবাসন হতে পারে। কেননা যারা ঝিনজিয়াং ছেড়ে বাইরে কাজ করতে এসেছে তাদের কাছে বাড়ির এমন সব আতঙ্কের খবর পৌঁছচ্ছে। তাদের পক্ষে বাড়িমুখো হওয়ার সম্ভাবনা কম। শুধু তাই নয়, তাদের যে এই ধরনের বিদেশি যোগাযোগ রয়েছে সেটা জানতে পারাই সরকারের চোখে তাদের সন্দেহজনক করে তুলবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জার্মানি এই বছরই উইঘুরদের চীনে ফেরত পাঠানোর পর্ব শেষ করেছে। অন্য দেশও সেই চেষ্টাই করবে। কাজাকিস্থান তার ঝিনঝিয়াং প্রবাসী নাগরিকদের নাগাড়ে গ্রেপ্তার হওয়ার খবরে উদ্বিগ্ন। জনৈক চীনা ক্যাম্প নিয়ন্ত্রকের বিবৃতি অনুযায়ী বহু চীনা-কাজাকিস্তানি ইতিমধ্যেই হিংসার বলি হয়েছে। এই ধরনের লাগাতার নির্যাতনের খবরে চীনের পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের বহু বন্ধু দেশই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। চরম পরণতিতেই কেবলমাত্র কোনও সরকারি নীতিগত পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে।

একজন হ্যান অঞ্চলের চীনা সমাজকর্মী কিছুদিন আগে বলেছেন এই ঝিনজিয়াংই ভবিষ্যৎ চীনের মুসলমান নীতির পথ প্রদর্শক হতে চলেছে। ইসলামের ওপর এই দমনমূলক নীতির প্রয়োগের ধারা দেশের অন্য অঞ্চলেও প্রয়োগ হবে। এই সূত্রে 'লিনসিয়া' অঞ্চলের একটি মসজিদ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সেখানকার হুই-চীনা ভাষাভাষীরা দীর্ঘদিন ধরেই নিজেদের নিরাপদ ভেবে আসছিল। তারা ধরে নিয়েছিল তারা সরকারি নাক গলানোর বাইরে আছে। হয়তো বা তারা রাষ্ট্রের সমর্থনও পাবে। আর চীন ঠিক এমনই মনস্থ করেছে এইটিই উপযুক্ত সময়। সংখ্যালঘুদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর খড়্গ নামিয়ে আনতে পারলে তারা এটাকে ইসলামের ওপরই আক্রমণ হিসেবে ধরে নেবে।

চীন হয়তো ভাষা সংস্কৃতি বদলের নামে বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। ঝিনজিয়াং প্রদেশে 'প্রোজেক্ট বিউটি' নামের যে অভিযান চলছে তাতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে যারা বোরখা পরছে, দাড়ি রাখছে, লম্বা ঝুলের জোব্বা পরছে সেই সমস্ত উইঘুর মুসলমানকে আলাদাভাবে শাস্তি দিচ্ছে।

অন্যদিকে লিনসিয়া অঞ্চলের মুসলমানরা তাদের মসজিদকে এক নতুন ধরনের জাতীয় স্থাপত্যশৈলী বলে চালাবার চেষ্টা করছে যেন তার সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্কই নেই। রাজরোষ থেকে তাতে তাদের মুক্তি পাবার সম্ভাবনা দুরাশা।

চীনের জাতি সংক্রান্ত নীতি ও অবস্থান দীর্ঘদিন ধরেই কিন্তু তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল দিচ্ছে। আর এটাই যে ঘটে চলবে তাও পরিষ্কার। সরকারি তরফে দুর্নীতি ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে উইঘুর মুসলমানরা উন্নয়ন ও তাতে তাদের যোগদান জনিত কোনও সুফলই পায়নি। পরিণতিতে চীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হওয়া মুসলমান বিদ্বেষের কোনও উপশমই করতে পারেনি।

অন্যদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় ঝিনজিয়াংয়ের ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপ প্রদেশটিকে একটি ক্রমবর্ধমান নজরদারির অঞ্চলে পরিণত করছে। পূর্ব চীনের নাগরিকরা বিশেষ করে যারা অতিকায় সব কারখানায় কাজ করে ও সেই অঞ্চলেই বসবাস করে তারাও ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রের তরফে নানা ধরনের শৃঙ্খলার প্রয়োগ ও নজরদারির শিকার হচ্ছে। বায়োমেট্রিক ডাটা ব্যবহার করে নাগরিকদের তীব্র নজরদারির আওতাধীন করা হয়েছে। পরিস্থিতি সঙ্গীণ।

(লেখক মনটানা বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ইতিহাস ও রাজনীতির সহকারী অধ্যাপক)

"বিশ্বের অন্য বহু দেশেই এই উইঘুর বা কাজাক মুসলমানদের অভিবাসন হতে পারে। কেননা যারা ঝিনজিয়াং ছেড়ে বাইরে কাজ করতে এসেছে তাদের কাছে বাড়ির এমন সব আতঙ্কের খবর পৌঁছচ্ছে। তাদের পক্ষে বাড়িমুখো হওয়ার সম্ভাবনা কম। শুধু তাই নয়, তাদের যে এই ধরনের বিদেশি যোগাযোগ রয়েছে সেটা জানতে পারাই সরকারের চোখে তাদের সন্দেহজনক করে তুলবে।"

উনিশে নরেন্দ্র মোদীকে হারাতে এক মঞ্চে ভারত বিরোধী সমস্ত শক্তি

সাধন কুমার পাল

ফ্রান্স থেকে রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনা নিয়ে রাহুল গান্ধী ও তার দল কংগ্রেস কোনও তথ্য প্রমাণ ছাড়াই বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লাগাতার আক্রমণ করে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বারবার বলা হচ্ছে রাফাল যুদ্ধবিমান কেনা সংক্রান্ত চুক্তিতে থাকা সমস্ত বিষয় দেশের নিরাপত্তা জনিত কারণের জন্য প্রকাশ্যে আনা যাবে না। যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের গোপনীয়তা যে স্বাভাবিক ব্যাপার এই বিষয়টি দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস দলের নেতাদের না জানার কথা নয়। তবুও এই ইস্যুতে কংগ্রেস হইচই অব্যাহত রেখেছে। এক শ্রেণীর মিডিয়া এ ব্যাপারে নানা গুজব ছড়িয়ে এই অপপ্রচারের আগুনে ঘি ঢালছে। কিছু মিডিয়া তো এই গুজবকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে ফ্রান্সের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মুখে কথা জুড়ে দিয়ে অপপ্রচারও করছে।

এর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যায় চীন নাকি রাফাল চুক্তি বাতিলের শর্তে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে লড়াই করার জন্য কংগ্রেসকে ২২ হাজার কোটি টাকার ফান্ড দিয়েছে। এই খবরের যথার্থতা যাচাই না করেই বলা যায় চীনের তরফে এই ধরনের প্রয়াস হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত শক্তিশালী হোক এটা চীন এবং পাকিস্তান কোনো ভাবেই চাইবে না। এ দিকে আবার ২০১৯ নির্বাচনে ভারতীয় মুসলমানরা যাতে ভোট দিয়ে কংগ্রেসকে জেতায় সেই ধরনের আবেদনও নানা ভাবে পাকিস্তানের তরফ থেকে আসতে শুরু করেছে। রাফাল নিয়ে রাহুল গান্ধীর টুইট পাকিস্তানের মন্ত্রীরা রি-টুইট করছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, কোনো ছোটোখাট আঞ্চলিক দল নয় শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেসকে সামনে রেখে দেশের শত্রুরা এভাবে সক্রিয় হতে পারে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

অতি সম্প্রতি ভিমা-কোরেগাঁও ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে এই ঘটনার ষড়যন্ত্রীদের কাছ থেকে যে সাতটি চিঠি উদ্ধার হয়েছে তাতেও সহযোগী হিসেবে একাধিকবার কংগ্রেস দলের উল্লেখ রয়েছে। এই সমস্ত চিঠির প্রতিটি লাইনে রয়েছে ভারতে চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি করে মোদী সরকারকে উৎখাতের পরিকল্পনা। এই ষড়যন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমি মহাশক্তিগুলির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত চার্চ সংগঠন, মাওবাদী গ্যাং ও জেহাদি গোষ্ঠী। বর্তমানে বিশ্বের কোনো দেশের পক্ষেই কোনো দেশে প্রত্যক্ষ ভাবে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করা সম্ভব নয়। সাদ্দাম হোসেনের অপসারণের পর মার্কিনিদের বকলমে ইরাকিরাই এখন সেই দেশ শাসন করছে। আফগানিস্থানেরও একই পরিস্থিতি। সময়ের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি দুটোই বদলেছে।

ভারত-সহ বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশ যারা এক সময় কোনো না কোনো ভাবে ঔপনিবেশিক শাসকদের পায়ের তলায় পিষ্ঠ হয়েছে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি এই দেশগুলিতে ইরাক বা আফগানিস্থানের মতো সরকার প্রতিষ্ঠিত করে ওই সমস্ত দেশকে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে এনে সম্পদ লুণ্ঠন ও শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিরন্তর ক্রিয়াশীল। স্বাধীনোত্তর ভারতেও এমন একটি ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে যে ক্ষমতায় আসার জন্য এখানে ভারত বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এমনকী শত্রুদেশের সমর্থন ও সাহায্য নেওয়াও দোষের নয়। সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থপ্রসূত প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই বর্তমান ভারতে পশ্চিমি মহাশক্তি ও চীনা এজেন্ট হিসেবে ক্রিয়াশীল এদেশের চার্চ সংগঠন, মাওবাদী, জেহাদি ও বিভিন্ন আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির এতটা বাড়বাড়ন্ত।

স্বাধীনতার পর থেকে চলে আসা তোষণ রাজনীতির ধারা ছিন্ন করে ২০১৪ সালে বিজেপির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা স্বাধীনোত্তর ভারতে ক্ষমতার অলিন্দে কলকাঠি নাড়তে অভ্যস্ত পশ্চিমি মহাশক্তি ও চীনা এজেন্টদের কাছে এক বিরাট ধাক্কা। সেজন্যই ২০১৪ সালের ১৬ মে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর, ১৮ মে সানডে গার্ডিয়ানের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল— 'Today, 18 May 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. Narendra Modi's victory in the elections makes the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the subcontinent. India under the Congress party was in many ways a continuation of the British Raj by other means.' স্বাভাবিক ভাবেই ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমি মহাশক্তি ও চীনা এজেন্টদেরও ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। এই লড়াইয়ের একটি ছোট্ট নকশা বহনকারী সাতটি চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়ার আগে একবার চোখ রাখা যেতে পারে আজকের দিনে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠা সংবিধান কার্যকরী হওয়ার সময় সংবিধান সভায় ড. বি আর আম্বেদকর প্রদত্ত ভাষণে উচ্চারিত কিছু আশঙ্কা, উদ্বেগ ভরা সাবধানবাণীতে।

ড. আম্বেদকর বলেছিলেন, 'এ রকম নয় যে ভারত এর আগে কোনোদিন স্বাধীন ছিল না। এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কয়েক শতাব্দী আগে ভারত স্বাধীনতা হারিয়েছে। এই জন্য ভাবনা হয় যে আবার যদি এরকম হয় তা হলে কী হবে। এই দেশেরই কিছু মানুষ বিদেশিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এই জন্যই দেশ স্বাধীনতা হারিয়েছে। এই জন্যই চিন্তা হয় যে আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না তো? কয়েক শতাব্দী ধরে এই দেশের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়া শত্রু এবং দেশের মধ্যে

ক্ষুদ্রস্বার্থ সামনে রেখে কার্যরত রাজনৈতিক দল এক হয়ে যদি দেশের স্বার্থ বলি দিতে উদ্যোগী হয় তাহলে কী হবে? এই ধরনের চিন্তাই আমাকে অস্থির করে দেয়। যদি এরকম হতে শুরু করে তাহলে যাঁরা এই দেশের জন্য গর্ববোধ করেন যতক্ষণ তাঁদের ধমনীতে একবিন্দু রক্ত থাকবে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

বর্তমান ভারতে এমন অনেক মানুষ বাস করেন যাঁরা এই দেশকে হিংসা অস্থিরতার জ্বলতে দেখে, টুকরো টুকরো হতে দেখে, ভয়ঙ্কর জাতি হিংসায় অশান্ত হতে দেখে কিংবা ভবিষ্যতে দেশের এমন একটি ভয়ঙ্কর ছবির কথা কল্পনা করে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন। এরা ভারতকে শত্রুদেশ ভাবেন, এদেশের দেশপ্রেমিক মানুষ, নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, দেশের সেনা ও প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের শত্রু ভাবেন। এরা আবার কোনো সাধারণ মানুষ নন। এদের মধ্যে অনেকেই সমাজকর্মী, দলিত নেতা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী এরকম নানা পরিচয়ে পরিচিত। এই আরবান নকশালরা ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় থাকে। এদের সিংহভাগেরই আদর্শগত শিক্ষা দীক্ষা পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাউথ এশিয়া স্টাডিজের আড়ালে চলতে থাকা অ্যান্টিইন্ডিয়া ল্যাবরেটরিগুলিতে।

এরা যে 'ইতিহাসের শুষ্ক পৃষ্ঠা থেকে বিস্ফোরক তৈরি' করতে পারে তার দৃষ্টান্ত গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ ঘটে যাওয়া ভীমা- কোরেগাঁওয়ের হিংসার ঘটনা। ২০০ বছর আগের এক যুদ্ধ জয়ের বিজয় দিবস পালন করতে ওই দিন দলিত সংগঠনের ব্যানারে পুণেতে এক বিশাল জমায়েত হয়েছিল। ভীমা কোরেগাঁও যুদ্ধ নামে পরিচিত ওই যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনী পুণের ব্রাহ্মণ পেশোয়া রাজাদের পরাজিত করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাহিনীতে বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন 'মাহার' নামক দলিত শ্রেণীর মানুষ। ব্রাহ্মণ রাজাদের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধ জয়কে দলিত সংগঠনগুলি এখন পালন করতে চাইছে হিন্দুত্ববাদী আর এস এস-এর মতাদর্শের বিরুদ্ধে জয় হিসাবে। ওই সমাবেশে গুজরাটের দলিত নেতা জিগনেশ মেওয়ানি, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা উমর খালিদ-সহ জাতীয় স্তরের দলিত নেতা-নেত্রীরা হাজির ছিলেন। আমার মনে হয় ২০০ বছর আগে ঘটে যাওয়া পরাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক শাসকের জয়কে দলিত শ্রেণীর জয় হিসেবে দেখিয়ে তার বিজয় দিবস পালনের নামে দাঙ্গা লাগানোর ঘটনাকে ভারত বিরোধী গবেষণাগারগুলির 'ইতিহাসের শুষ্ক পাতা থেকে বোমা তৈরির দৃষ্টান্ত' না বলে উপায় নেই।

ভীমা-কোরেগাঁও ঘটনার তদন্তে নেমে মহারাষ্ট্র পুলিশ সাতটি চিঠি উদ্ধার করেছে। ভারত-বিদ্বেষের বারুদ ভরা এই সমস্ত চিঠিতে এমন কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে যাঁরা টিভি চ্যানেলে বসেন, বিতর্কে অংশ নেন, অভিযোগ করেন এই দেশে গণতন্ত্র নেই। এই দেশের সমস্ত ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা ভাব পোষণ করেন। পুনের ভীমা কোরেগাঁওয়ে ইয়ালগার পরিষদের জাতিদাঙ্গা, অগ্নি সংযোগের, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস যজ্ঞের কর্মসূচির দু' দিন পর অর্থাৎ ২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে কমরেড 'এম' নামক এক ব্যক্তি কমরেড 'রোনা'কে লেখা চিঠিতে কমরেড ওমর ও কমরেড জিগনেশকে এই আন্দোলনের ইয়ং ফাইটার বলে উল্লেখ করে এই আন্দোলনে দলিত নেতা কমরেড প্রকাশ আম্বেদকরের জোরালো সমর্থনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ভবিষ্যতে এদের সহায়তায় আরও বেশ কিছু দলিত আন্দোলন সফল করতে হবে। এই চিঠিতে বলা হয়েছে ভীমা কোরেগাঁও আন্দোলন অত্যন্ত সফল হয়েছে। এই আন্দোলনে যুবকের মৃত্যুর ঘটনাটি একটি বড় ইস্যু বানাতে হবে, এই মৃত্যুর ইস্যু দিয়ে প্রোপগ্যান্ডা ম্যাটেলিয়্যাল বানাতে হবে, সেই সঙ্গে এই মৃত্যুর ঘটনা দিয়ে আরও বড় কোনো আন্দোলন উস্কে দেওয়ার কাজ করতে হবে। চিঠিতে 'হাইয়ার কমিটি' নামে এক কমিটির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এই সমস্ত আন্দোলন উস্কে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও ওই কমিটি থেকে এসে গেছে। এই ব্যাপারে লন্ডনে থাকা বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে বলা হয়েছে।

আরবান নকশালদের হয়ে লড়াই করছে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা হিসেবে পরিচিত অভিষেক মনু সিংভি ও কপিল সিব্বালদের মতো সুপ্রিম কোর্টের দুঁদে আইজীবীরা। এই আইনজীবীরা কোনো মামলায় একবার কোর্টে দাঁড়ালে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা নেন। এত টাকা এই সর্বহারা দলিত বুদ্ধিজীবী লেখক কবিদের কে জোগাচ্ছে, নাকি কংগ্রেসের আইনজীবীরা বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিচ্ছেন এই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় আসা প্রয়োজন।

এই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, সিপিআই (মাওবাদী) দল থেকে আসা আমাদের কিছু সিনিয়ার আরবান কমরেড কংগ্রেসের কিছু বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছে যারা তাদের এই দলিত আন্দোলনকে আরও আক্রমণাত্মক ভাবে চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইনি ও আর্থিক সহযোগিতা জিগ্নেশের মাধ্যমে পৌঁছানোর আশ্বাস দিয়েছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, বিজেপি সরকারে আসার পর এই প্রথম কোনো আন্দোলন নিয়ে এতটা চাপে পড়েছে। এই চিঠিতে আর এস এস ও বিজেপির বিরুদ্ধে দলিত ক্ষোভকে উস্কে দিতে ভবিষ্যতে এই ধরনের আন্দোলনের আগুন একই সঙ্গে অন্য রাজ্যেও ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যাতে ২০১৯ সালে নরেন্দ্র মোদীকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। গুজরাট নির্বাচনে এই ধরনের পরিকল্পনার সুফল পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাওবাদীরা প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্ম ও জাতপাতের ঊর্ধ্বে উদার মানবতাবাদী

বলে জাহির করে রাজনীতিকে এসবের ঊর্ধ্বে রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে কিছু বিদেশি শক্তির সাহায্য নিয়ে এই দেশকে জাতপাতের আগুনে ঝলসে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারই মাওবাদীদের মূল লক্ষ্য। এই চিঠি থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেশে জাতপাতের নামে ঘটে যাওয়া হিংসাত্মক ঘটনা কিংবা মব লিংচিংয়ের ঘটনাগুলির পেছনে কারা রয়েছে। এই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে জেলবন্দি সিনিয়ার কয়েকজন মাওবাদী নেতাকে মুক্ত করানোর জন্য কংগ্রেস নেতারা আইনি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। এই চিঠিতে দলিত সেন্টিমেন্টকে উস্কে দিয়ে বিজেপি ও আর এস এসের মোকাবিলার কথাও বলা হয়েছে। আরেকটি চিঠি যার লেখক কমরেড প্রকাশ কমরেড রোনাকে লিখেছেন যে ভীমা-কোরেগাঁও আন্দোলন ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা কমরেডদের সংগঠিত করে আর এস এস-বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এই আন্দোলন এমন জোরদার করতে হবে যে ২০১৯-এর লোকসভায় মোদী যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে।

উল্লেখ্য, এই বছর জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের উল্লেখ থাকা পত্র সামনে আসে। দিল্লির সমাজসেবী রোনা উইলসনের ঘর থেকে ১৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে লেখা এই চিঠি উদ্ধার হয়েছে। ৮ কোটি টাকায় এম-৪ রাইফেল ও চার লাখ রাউন্ড গুলি কেনা এবং রাজীব গান্ধীর মতো ঘটনার কথা উল্লেখ রয়েছে চিঠিতে। উদ্ধার হওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, 'কমরেড প্রকাশ, লাল সেলাম...হিন্দু ফ্যাসিস্টকে হারানোই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও অ্যাজেন্ডা। গোপন সেল ও অন্যান্য সংগঠনের নেতারাও এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। দেশজুড়ে সমমনোভাবাপন্ন দল, রাজনৈতিক দল, সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের একত্রে আনার চেষ্টা করেছি আমরা। আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন করছে মোদীর নেতৃত্বাধীন ফ্যাসিস্টরা। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে হারলেও ১৫টিরও বেশি রাজ্যে সরকার গঠনে সমর্থ হয়েছেন মোদী। এই গতিতে চলতে থাকলে সবদিক থেকে বেকায়দায় পড়বে দল। মোদী জমানা শেষ করার জন্য পোক্ত পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছেন কর্নেল কিষান ও অন্য প্রবীণ কমরেডরা।' এই চিঠিতেও প্রেরক নিজের কোড নাম হিসেবে 'আর' অক্ষরটি ব্যবহার করেছিল।

একটি চিঠি কম: প্রকাশ কম: সুরেন্দ্রকে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে লিখেছেন। এই চিঠিতে যুবক ক্যাডার ভর্তির কথা বলা হয়েছে। এই চিঠিতে কম: প্রকাশ কম: সুরেন্দ্রকে বলেছেন তার, নাইট্রেট পাওডার ও অন্যান্য জিনিস বিজাপুরের মাইনিং কন্ডাক্টারের কাছে থেকে সংগ্রহ করার নির্দেশ দিচ্ছে। কমরেড অরুণ নামে এক ব্যক্তির প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে এই ব্যক্তির জন্যই বড় সংখ্যায় রিসার্চ স্কলারদের আন্দোলনে শামিল করা সম্ভব হয়েছে। ওকে এই আন্দোলন মুম্বই পুনে আমেদাবাদ ও কোঙ্কন প্রান্তে বিস্তার করতে বলা হয়েছে। পরে লেখা হয়েছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন ডুসু, জে এন ইউ-এর ছাত্র সংগঠন জে এন ইউ এস ইউ, এ পি এস ই, এ আই এ এস এফ, এন এস ইউ আই এই ছাত্র সংগঠনগুলিকে কাজে লাগিয়ে সমস্ত দেশে ছাত্র আন্দোলন তৈরির কথা বলা হয়েছে। দেশ জুড়ে ছাত্রদের দিয়ে জোরদার আন্দোলন করাতে হবে, কারণ রাষ্ট্রশক্তি সে ভাবে ছাত্রদের মোকাবিলা করতে পারবে না। এখানে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। কংগ্রেস নেতারা এই ধরনের কর্মসূচিতে খুবই আগ্রহী। কংগ্রেস নেতারা এই ধরনের আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের আশ্বাসও দিয়েছে। এর থেকেই স্পষ্ট পরিকল্পনা করেই দেশ জুড়ে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অসন্তোষের নামে অশান্তি ছড়ানো হচ্ছে। জে এন ইউ, যাদবপুর, বেনারস, দিল্লি, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিক্ষোভের নামে অশান্তি ছড়ানো হয়েছিল বাস্তবে ছিল সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফসল।

৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে একটি চিঠি বিজয়ন নামে এক ব্যক্তিকে 'এস এস' সাংকেতিক নাম ব্যবহার করে একজন লিখেছে যাতে খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে ওদের কাজের জন্য গত পাঁচ বছরে কম করে ২৫ শতাংশ আদিবাসী ধর্মান্তরণ হয়ে যিশুর অনুগামী হয়েছে। এই চিঠিতে রাজ্য সরকার দ্বারা ধর্মান্তর বিরোধী আইন নিয়ে চিন্তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এমন কী এই আইন বাতিলের জন্য ঝাড়খণ্ডের বিজেপির সিনিয়র নেতাদের কিডন্যাপ করার কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে খ্রিস্টান মিশনারিদের ক্রিয়াকলাপ আদিবাসী সমাজের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত লাভদায়ক। এই জন্যই বিগত পাঁচ বছরে ২৫ শতাংশ আদিবাসী মানুষ খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে।

একটি চিঠিতে বলা হয়েছে বিভিন্ন সময় গেরিলা যুদ্ধ ও আইনি লড়াইয়ের জন্য কমরেড ভারভারা রাও কিছু ফান্ডের ব্যবস্থা করেছে। একটি চিঠিতে কম: মিলিন্দ নামে এক ব্যক্তি বলছেন যে কমরেড ভারভারা রাও ও আইনি সাহায্যকারী কম: সুরেন্দ্রের মার্গদর্শনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত হামলায় বেশ প্রচার প্রসিদ্ধি হয়েছে। এই সমস্ত হামলার জন্য প্রয়োজনীয় ফান্ডের ব্যবস্থাও কমরেড ভারভারা রাও করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। মহারাষ্ট্র পুলিশের এডিজি পরমবীর সিংহ মুম্বইয়ে প্রেস কনফারেন্স করে একটি চিঠি পড়ে শুনিয়েছেন। এই চিঠি কম: সুধা (ভরদ্বাজ) কম: প্রকাশকে লিখেছেন। প্রথমেই বলা হয়েছে জব্বলপুর লিগ্যাল এইড তথা ছত্রিশগড় সলিডারিটির নেওয়ার্কের সংগঠনাত্মক কাজ অত্যন্ত ভালো ভাবে চলেছে। পরে বলা হয়েছে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কমরেড অঙ্কিত ও কম: গৌতম নওলখা এবং শত্রুদের দ্বারা মানবাধিকার হনন সম্পর্কিত ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়া ও মিডিয়া হাউসগুলির মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পেলেট গান নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলা মামলায় লিগ্যাল এইড-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য কমরেড প্রশান্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এই আরবান নকশালদের অনেকেই গ্রেপ্তার ও গৃহবন্দি হলেও এদের উপযুক্ত শাস্তি হবে কিনা সে আশঙ্কা থেকেই যায়। কারণ এদের হয়ে লড়াই করছে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা হিসেবে পরিচিত অভিষেক মনু সিংভি ও কপিল সিব্বালদের মতো সুপ্রিম কোর্টের দুঁদে আইজীবীরা। এই আইনজীবীরা কোনো মামলায় একবার কোর্টে দাঁড়ালে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা নেন। এত টাকা এই সর্বহারা দলিত বুদ্ধিজীবী লেখক কবিদের কে জোগাচ্ছে, নাকি কংগ্রেসের আইনজীবীরা বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দিচ্ছেন এই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় আসা প্রয়োজন।

আপনি পিঁপড়ের মতো পিষে ফেলতে পারবেন না

ড. জিষ্ণু বসু

> আসদারুজ্জামানদের অত্যাচার যত বীভৎস হবে, তত বেশি করে এদের ঘৃণা করবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, আপামর বাঙ্গালি। মায়ের অপমান, মাতৃজাতির উপর এমন পাশবিক অত্যাচার হিন্দু বাঙ্গালি মেনে নিতে পারে না।



টি এম সি নেতা আসদারুজ্জামান বিজেপি নেত্রী নীলিমা দে সরকারকে নির্মমভাবে লাথি মারছে।

উত্তর দিনাজপুরে ইসলামপুরের দাড়িভিট হাইস্কুলে বাংলা শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল বহুদিন থেকে। পরিবর্তে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উর্দু শিক্ষক পাঠানো হয়েছিল। স্কুলে বাংলা, বিজ্ঞান-সহ অন্য বিষয়ে শিক্ষক নেই। পড়ুয়াদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগের বেশি হিন্দু। বাকিরা মুসলমান হলেও উর্দুভাষী নয়। তাই প্রতিবাদ। স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, পুলিশ গুলি চালিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী কোনো তদন্ত হওয়ার আগেই বলেছেন, পুলিশ গুলি চালায়নি, সবটাই আর এস এসের চক্রান্ত। বিদেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রীও তাই বললেন। কিন্তু পুলিশের সামনে রাইফেল থেকে গুলি কে চালালো? একজন নয়, দু'জন নয় পঞ্চাশ জনের উপর পুলিশের সামনে লাগাতার গুলি চলল? আততায়ী নিরুদ্দেশ, অস্ত্র গায়েব? আর এস এসের গুণ্ডারা বিদ্যার্থী পরিষদের ছেলেদের উপর গুলি চালাল? এইসব হিং টিং ছট প্রশ্ন রাজ্যের আপামর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে। এস এফ আই এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে, প্রদেশ কংগ্রেস কলকাতায় মিছিল করেছে। সুশীল সমাজ গত ২৩ তারিখে সন্ধ্যায় মহানগরীতে প্রতিবাদ পদযাত্রা করেছে। ২৫ তারিখ দুপুরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ি থেকে মহামিছিল করেছে। ঠিক তার পরের দিনই ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলা বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল।

এই বন্‌ধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রাজ্যের এক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মন্ত্রী এক অদ্ভুত কথা বলেছেন। মন্ত্রীমশাই মূলত উর্দুভাষী। মাত্র এক প্রজন্ম আগেই বিহার থেকে কলকাতার খিদিরপুর বন্দর এলাকায় এসেছিলেন কাজ নিয়ে। উর্দুর বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের এই বেয়াদপি তার না-পসন্দ! তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। তিনি বলেছেন যে, তারা বিজেপিকে পিঁপড়ের মতো মেরে ফেলতে পারেন!

মন্ত্রীর মন্তব্য মানে কর্মীদের কাছে আদেশ। সেদিন সারা রাজ্যে তৃণমূলের উন্নয়নের যারা মুখ তারা রাস্তায় বন্‌ধ সমর্থকদের প্রাণ ভরে পিটিয়েছে। সবচেয়ে নিষ্ঠাভরে যিনি মন্ত্রীর আদেশ পালন করেছেন তার নাম মহম্মদ আসদারুজ্জামান। বারাসাতের এক পঞ্চায়েত প্রধান। বারাসাতের রেলগেটে বিজেপি সমর্থকেরা পিকেটিং করছিলেন। আসদারুজ্জামানের বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হাতের পতাকা কেড়ে নিয়ে বেধড়ক মারতে থাকে। নীলিমা দে সরকার নামের বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী সেখানে ছিলেন। আসদারুজ্জামান সেই মহিলাকে পেছন থেকে সজোরে লাথি মারেন। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরাতে উঠে এল সেই ছবি। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখলেন সেই ভয়ানক ঘটনা।

এই ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আল-বদর, আল-শামস আর রাজাকারদের আচরণ মনে করিয়ে দিল। সেদিনও লড়াইটা উর্দুর সঙ্গে বাংলা ভাষার ছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ববঙ্গের হিন্দু মেয়েদের গনিমতের মাল (যুদ্ধে লুঠের জিনিস) বলে ঘোষণা করেছিলেন। এরকমই পূর্ববঙ্গের পথে ঘাটে লাঞ্ছিতা হতেন হিন্দু মা-বোনেরা। আজও যেমন বারাসাতের মানুষ জানেন যে আসদারুজ্জামান বা ওর সহযোগীদের কোনো শাস্তি হবে না। সেদিনও সবাই জানত যে উর্দুর পক্ষে যেসব রাজাকার, তাদের

কোনো শাস্তি হবে না!

ভারতে উর্দু মুসলমান শাসনে তৈরি হওয়া ভাষা। আরবি আর হিন্দুস্থানির মিলিত রূপে তৈরি হওয়া ভাষা। মুসলমান শাসনে যারা উর্দি বা ইউনিফরম পরতেন তাদের মুখের ভাষা ছিল এটি। পরবর্তীকালে অনেক সুন্দর সাহিত্যও রচনা হয়েছে এই ভাষায়। মুন্সী প্রেমচাঁদের জীবনের প্রথমভাগের লেখাও উর্দুতে। অন্য আরও ৫টি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও উর্দু সরকারি ভাবে স্বীকৃত একটি ভাষা। তাই উর্দু বা বাংলার প্রতিযোগিতা অর্থহীন। কিন্তু বাংলার মাটিতে বারবার দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই উর্দু আর বাংলার লড়াই।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকেই বাংলাদেশে উর্দুভাষী বিহারি রাজাকারদের উপর সাধারণ বাঙ্গালিদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে। তার কারণ, ছিল ওই উর্দুভাষীদের অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। গণহত্যা, অকাতরে ধর্ষণ রাজাকারদের নিয়মিত বিষয় হয়ে গিয়েছিল। চট্টগ্রামে মুক্তিবাহিনী প্রথম বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিল। তারপরের ইতিহাস সবারই জানা। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকাতে মুক্তি যোদ্ধা ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ শক্তির কাছে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হওয়ার পরে শেষ হয়েছিল সেই অন্ধকার অধ্যায়। জন্ম নিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। জিতে গেল বাংলাভাষা।

কিন্তু সেই উর্দুভাষী বিহারিরা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কোথায় গেলেন? অনেকেই পশ্চিম পাকিস্তান বা বিহারে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাদের সেখানকার মানুষ আর গ্রহণ করেননি। তারা ঘুরে ফিরে আবার পশ্চিমবঙ্গেই ফিরে আসেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মল্লিকপুরের মতো বহু জায়গায় তারা পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে থাকেন।

খিদিরপুর উর্দুভাষীদের আর একটি বড় এলাকা। মূলত বন্দরের কাজের জন্য পশ্চিমের থেকে তারা এসে বসবাস শুরু করেন। মন্ত্রী তার নির্বাচনী এলাকাকে 'মিনি পাকিস্তান' বলেছিলেন (ডন ২৯ এপ্রিল ২০১৬)। এটা নিছক কথার কথা নয়। এর পেছনে একটা আত্মশ্লাঘা আছে। মানে এখানে ভারতবর্ষের পুলিশ প্রশাসন কোনো কাজ করবে না। এই আত্মতুষ্টির কারণ অবশ্যই আছে। ১৮ মার্চ ১৯৮৪ সালে ডিসিপি (বন্দর) বিনোদ কুমার মেহতা দিনের বেলায় ওই এলাকায় খুন হন। তখন বামফ্রন্টের রাজত্ব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বসুর সরকার একজন অপরাধীকেও শাস্তি দিতে পারেনি। এবছরও ফেব্রুয়ারি মাসে মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট যখন পুনম কুমারী দাস ওরফে গুড়িয়াকে খুঁজে আনতে বলে, পুলিশ জানায় যে ওই এলাকাতে গিয়ে খুঁজে আনার সাহস তাদের নেই। আজও ওই গরিব পরিবারের নাবালিকাকে পুলিশ আদালতে হাজির করতে পারেনি!

কিন্তু তা থেকে এত সাহস, এত আত্মপ্রত্যয় আসবে কেন? সারা পশ্চিমবঙ্গটা তো আর মোমিনপুর নয়। এসেছে কতগুলি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য। নিষিদ্ধ সিমির কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এক উর্দুভাষী। বর্তমান রাজনৈতিক শক্তি তাঁকে বাংলার প্রতিনিধি করে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে। কলকাতার এক মসজিদের উর্দুভাষী ইমামকে বছরের পর বছর এক্সট্রা কন্সটিটিউশনাল পাওয়ার দেওয়া হয়েছিল। তিনি খোদ কলকাতায় বসে একের পর এক মধ্যযুগীয় ফতোয়া দিয়ে গেছেন। বাংলাদেশের কবি তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে তাড়ানোর জন্য যারা ২০০৭ সালে দাঙ্গা করেছিলেন, ৩০ মার্চ ২০১৩, বাংলাদেশে রাজাকার দেলওয়ার হোসেন সিদ্দিকির সমর্থনে যারা কলকাতা ময়দানে প্রধানমন্ত্রী হাসিনার ফাঁসির দাবিতে বিশাল সভা করেছিলেন, সেইসব উর্দুভাষী নেতারাই বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারা সরকারের উপর চাপ বাড়িয়েছেন। পাঠ্য পুস্তকে 'আকাশ' হয়ে গেছে 'আসমান', 'রামধনু' হয়ে গেছে 'রংধনু'। ইসলামপুরে দাড়িভিটের মতো স্কুলগুলোতে নুরুল হুদার মতো কোনও না কোনও এজেন্টের মাধ্যমে একটু একটু করে ঢোকানো হচ্ছে উর্দুকে। যেখানে বিগত পঞ্চাশ বছরে উর্দুর কোনো নাম গন্ধ ছিল না।

তাই পিঁপড়ের মতো পিষে ফেলার বাসনাটা দুটি রাজনৈতিক দলের রেষারেষি, রণহুংকার ভাবলে ভুল হবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য এটি আজ সভ্যতার সংকট। সংকট বাংলার আকাশে এর আগেও এসেছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বর্ণনায় উঠে এসেছে হুসেন শাহের অত্যাচারময় দিনের কথা। সেদিন শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়েছিলেন লড়াইয়ের কৌশল। তাই তো এত কিছুর পরেও বাংলা আফগানিস্তান হয়ে যায়নি। ১৯৪৬ সালে হুসেন মহম্মদ সোহরাওয়ার্দি কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশানের ডাক দিয়েছিলেন। সেটাও একরকম 'পিষে ফেলার' ডাক। কিন্তু সেদিন ড. শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে বঙ্গভূমি রুখে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের পিষে ফেলাটা তাই এত সহজ নয়। চৈতন্যদেব, বিবেকানন্দ, স্বামী প্রণবানন্দ, হরিচাঁদ ঠাকুরের বাংলাকে পিষে ফেলা এত সহজ নয়। ১৪৯৪-তে পারেননি, ১৯৪৬ সালেও নয়, ১৯৭১ সালেও সফল হননি, ২০১৮ সালেও পারবেন না, চ্যালেঞ্জ।

আসদারুজ্জামানদের পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ হয়তো কোনো শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। তবে সারা পৃথিবীর সভ্য জগৎ মহিলাদের উপর এমন আচরণকে বর্বরতা হিসাবে গণ্য করে। বিভিন্ন দেশে এমন অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। এখানে আসদারুজ্জামানদের অত্যাচার যত বীভৎস হবে, তত বেশি করে এদের ঘৃণা করবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, আপামর বাঙ্গালি। মায়ের অপমান, মাতৃজাতির উপর এমন পাশবিক অত্যাচার হিন্দু বাঙ্গালি মেনে নিতে পারে না। যুদ্ধের সূচনা হয়ে গেছে বারাসাতে, যেখানে মায়ের গায়ে পদাঘাত হয়েছে সেই যুদ্ধভূমির মাটি নিয়ে মানুষ আসন্ন দুর্গাপূজার মণ্ডপে মণ্ডপে স্থাপন করবে। এবার নবীন মন্ত্রে জননীর উদ্বোধন হবে। রূপং দেহি, ধনং দেহি প্রার্থনা এই মহাবিপদের মুহূর্তে ভুলে থাকলেও চলবে, উচ্চারিত হবে—

চণ্ডিকে সততা যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনী।
দ্বিষো জহি, দ্বিষো জহি, দ্বিষো জহি দ্বিষো জহি।

■

হিন্দু : এক বিপন্ন জাতিসত্তা

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত নয়াদিল্লিস্থিত বিজ্ঞান ভবনে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এই সঙ্ঘের সম্বন্ধে বহু মানুষের মনে অনেক ভুল ধারণা আছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, কতিপয় স্বার্থান্বেষী রাজনীতিক বিশেষত যারা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে, কিছু তথাকথিত বামপন্থী বিদ্বজ্জন, যারা মূলত হিন্দুবিদ্বেষী, তাদের দীর্ঘকালীন অপপ্রচার এবং অজ্ঞতা বহু মানুষের মনে সঙ্ঘ সম্বন্ধে ভুল ধারণার জন্ম দিয়েছে।

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মোহনজীর ওই সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু ওই দলগুলি সম্মিলিত ভাবে সভা বয়কট করে, ওই দলগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দলও ছিল, এছাড়া নবীন পট্টনায়ক, অখিলেশ যাদব, মায়াবতী, উদ্ধব ঠাকরে ইত্যাদির কেউই অংশগ্রহণ করেননি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও এর ব্যতিক্রম নয়। ধর্মান্ধ মুসলমান দলগুলির কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। যেমন এ আই এম আই এম দলের আসাদুদ্দিন ওয়েইসি, তিনিও বয়কট করেছেন। বিরোধী দলগুলি এবং আরও যে বিদ্বজ্জনরা বয়কট করলেন সঙ্ঘের সভা, তাঁরা কি সহিষ্ণুতার পরিচয় দিলেন? তাঁরা তো দেশে এবং বিদেশে হিন্দুত্বকে 'অসহিষ্ণু' বলে প্রচার চালাচ্ছেন ২০১৪ সাল থেকে লাগাতার, এবার তাঁরা একটু আত্মসমীক্ষা করে দেখুন। মোহনজী তাঁর ভাষণে বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তাদের বিচারধারা মেনে নেওয়ার জন্য কাউকে কোনওদিন জোর করেনি, জোর করবেও না। ভারতের সংস্কৃতি বহুত্ববাদের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। সঙ্ঘ যেহেতু গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, সেহেতু বিরুদ্ধ মত সঙ্ঘের কাছে সর্বদাই স্বাগত। সঙ্ঘ সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার পক্ষপাতী। দেশের অগ্রগতির জন্য সকলের সহযোগিতা কাম্য, আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

এখানে একটি কথা না বললেই নয়, সেটি হচ্ছে যে স্বার্থান্বেষী মহল সঙ্ঘের সমাজ-সেবামূলক কাজগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। সম্প্রতি কেরলে যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়ে গেল, সেখানে আর এস এসের স্বয়ংসেবকরা সবার আগে ছুটে গেছে ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে। দুর্গতদের বন্যার কবল থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া, তাদের খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা--- এ সবই তাঁরা নিষ্ঠাসহকারে করে গেছে বেশ কয়েকদিন যাবৎ। এটাই প্রথম নয়, বিভিন্ন সময়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকবৃন্দ আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। দেশভাগের পর যখন পূর্ববঙ্গ থেকে কাতারে কাতারে শরণার্থী সর্বস্ব খুইয়ে কোনও প্রকারে প্রাণটুকু সম্বল করে এ পারে পালিয়ে এসে শিয়ালদা স্টেশনে ঠাঁই নেয়, তখন তাদের খাদ্য পানীয়, ওষুধপত্র জোগান দিয়েছে এদেরই পূর্বসূরীরা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি জাতীয়তাবাদী সমাজ সেবামূলক সংস্থা। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই সংস্থার উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করা এবং ভারতের নবীন প্রজন্মের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ করা এরা কর্তব্য বলে মনে করে। বাস্তবে আমরা দেখি যে এই সংস্থা একেবারেই প্রচার বিমুখ। এরা নীরবে সমাজসেবা করে চলেছে, সমাজে এদের যে সদর্থক ভূমিকা, তা অনেকেরই অজানা। স্বার্থান্বেষী মহল এই সংস্থা সম্বন্ধে লাগাতার অপপ্রচার চালিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার কাজটি নিপুণ ভাবে করে এসেছে এতকাল। এখন মানুষ ক্রমশ বুঝতে পারছে দেশের আসল শত্রু কারা। জে এন ইউ-র বিপথচালিত ছাত্ররা যখন আওয়াজ তোলে— 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনশা আল্লা ইনশা আল্লা' অথবা 'আফজল গুরু জিন্দা রহে, আফজল গুরু অমর রহে', তখন মোদী বিরোধী পলিটিশিয়ানের দল এবং তাদের বংশংবদ সিউডো- ইন্টেলেক্চুয়ালের দল ওইসব ছাত্রনেতাদের (উমর খালিদ, কানহাইয়া কুমার) হিরোর আসনে বসায়। তাঁরা কিন্তু ওইসব 'টুকরে টুকরে গ্যাং'দের উদ্দেশে একবারের জন্যও কোনও নিন্দাসূচক উক্তি করেনি, ফলে রাতারাতি 'হিরো' হয়ে যাওয়া তথাকথিত ছাত্রনেতারা প্রশ্রয় পেয়ে যায়, বামপন্থীরা ওদের সমালোচকদের মুখবন্ধ



করার জন্য 'বাকস্বাধীনতা'র দোহাই দেয়। বামপন্থীদের গুরুঠাকুর চীনে এই ধরনের দেশবিরোধী স্লোগান দিলে পরদিন থেকে ওই স্লোগানদাতাদের খুঁজে পাওয়া যেত না।

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের পুনের পুলিশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, পাঁচজন আরবান নকশালকে গৃহবন্দি করেছে। পুলিশ জানতে পেরেছে যে ওই পাঁচজন ব্যক্তি মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত। আমরা জানি মাওবাদী সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মাওইস্ট) নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই, তাদের বেপরোয়া হিংসাত্মক এবং অবশ্যই রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য। এতদসত্ত্বেও বেশ কিছু লোকজন, এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত, কারও বা কবি হিসাবে পরিচিতি আছে, কেউ কেউ নিছক প্রচারের লোভে মাওবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। পাঁচজন তথাকথিত Activist-এর মাওবাদীদের সঙ্গে যোগসূত্রের সপক্ষে পুলিশের কাছে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ ছিল। যেহেতু তারা মোদী বিরোধী, কিছু বুদ্ধিজীবী যেমন রোমিলা থাপার যাঁকে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা একজন নামকরা নেহরুভিয়ান ইতিহাসবিদ বলেই জানে, তিনি মাঠে নেমে পড়েছেন এদের নির্দোষ প্রমাণ করতে। ওই পাঁচজন হলেন সুধা ভরদ্বাজ, ভারাভারা রাও, ভারনন্ গনজালভেজ, অরুণ ফেরেরা এবং গৌতম নওলাখা। এরা সিপিআই (মাওইস্ট) দলের বেশ কিছু নেতার সঙ্গে চিঠিপত্রে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতেন, ওই দলের সেন্ট্রাল কমিটির মিটিংয়ে যোগ দিতেন, ওই দলের অ্যাজেন্ডায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার পরিকল্পনাও পুনে পুলিশের কাছে ফাঁস হয়ে যায়। বিষয়টি এখন দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিবেচনাধীন।

আসল ব্যাপারটা হলো যেন তেন প্রকারেণ মোদী সরকারকে উত্যক্ত করে যেতে হবে। এই নিষিদ্ধ সংগঠনটি অর্থাৎ এই সিপিআই (মাওইস্ট) আদিবাসী-দরদী সেজে থাকে, দলিত-দরদি সেজে থাকে, মুখোশের অন্তরালে অনগ্রসর মানুষগুলিকে খেপিয়ে তোলা, তাদের মগজধোলাই করে হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা এদের প্রধান কাজ। এদের মধ্যে দেশপ্রেমের লেশমাত্র নেই, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য কোনও দরদ নেই। পাহাড় সিংহ নামে এক নকশাল নেতা পুলিশকে জানিয়েছে যে অরুণ ফেরেরা মাওবাদী দলের স্টেট কো-অর্ডিনেশন গ্রুপের একজন সদস্য।

এইসব দেশদ্রোহীদের চিনে নেওয়া দরকার। এরা নিজেদের অ্যাক্টিভিস্ট বলে দাবি করে, তারা যেন নকশালদের বিষয়ে জানতে আগ্রহী। কেন? এরা কি নৃতত্ত্ববিদ? তা তো নয়। প্রকৃতপক্ষে এরা দিনে অ্যাক্টিভিস্ট, রাত্রে টেরোরিস্ট, নিজদের মানবাধিকার কর্মী বলে দাবি করা এই বিদ্বজ্জনেরা গণশত্রু বলে অভিহিত হলে কি ভুল হবে? একথাও শোনা যাচ্ছে যে এই সব লোকজনের বিদেশে কোথাও টিকি বাঁধা আছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে এই সব মাওবাদী নকশালরা কখনো কোনও বড় শিল্পপতি বা কোনও কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে কোনও প্রকার সংঘাতে যায়নি। রাষ্ট্র বিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত এই সব নকশালদের উদ্ধার করার জন্য রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস দলের বরিষ্ঠ নেতা অভিষেক মনু সিংভী সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কংগ্রেস এবং তাদের ধামাধরা দোসর কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্মে যারা লিপ্ত তাদের সমর্থন করতে কখনোই দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ, উদারচেতা, প্রগতিশীল বলে মনে করে, অথচ এদের হিন্দু-বিদ্বেষ আজ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কেউ কোথাও নিহত হয়েছে শুনলে এরা প্রথমেই জেনে নেয় তার ধর্ম কী, সেই অনুযায়ী এদের প্রতিক্রিয়া। আসিফার ঘটনা বর্বরোচিত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু কামদুনির গণধর্ষণের ঘটনাটাও কি বর্বরোচিত ছিল না? এখানেও ধর্ম দেখে বিরোধীপক্ষ এবং তাদের বশংবদ মিডিয়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। আসিফার ঘটনা দেশে এমনকী বিদেশেও 'গেল গেল রব তুলে দিয়েছে, আসিফার ঘটনাকেও কেন্দ্র করে হিন্দুবিদ্বেষী সেকুলারবাদীরা হিন্দুত্বকে কাঠগড়ায় দাড় করিয়েছে, অথচ কামদুনির কথা তারা গুরুত্ব দেয়নি। কারণ এখানে আক্রান্ত এক হিন্দু কলেজ ছাত্রী, ধর্ষকরা ছিল জেহাদি। তমলুকের নবম শ্রেণীর ছাত্রী রিয়ার ধর্ষণ এবং হত্যা নিয়ে কেন হৈচৈ হয় না? ফিরহাদ হাকিমের গর্বের 'মিনি পাকিস্তান' গার্ডেনরিচে বিনোদ দাসের মেয়ে বন্দি অবস্থায় মাসের পর মাস ধর্ষিতা হয় জেহাদিদের দ্বারা, সে জীবিত না মৃত আজও জানা যায় না। বোলপুরের ডাঙাপাড়া গ্রামের দরিদ্র কলেজছাত্রী পূজা সরকারের স্নানের দৃশ্য গোপনে ভিডিও করে সেটা ইন্টারনেট মারফত পাব্লিক করে দেবার ভয় দেখিয়ে তাকে লাগাতার ধর্ষণ করা হতে থাকে, লজ্জায়, অপমানে, অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যেহেতু এখানে আক্রান্তের নাম পূজা আর দুষ্কৃতকারীর নাম হাফিজুল শেখ, সেকুলার লবি টুঁ শব্দ করে না, কেন? মায়ানমার থেকে বিতাড়িত জঙ্গি মনোভাবাপন্ন রোহিঙ্গাদের জন্য মোদী-বিরোধীদের মধ্যে সহানুভূতির প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে তারা ট্রাক বোঝাই হয়ে দলে দলে ঢুকছে তৃণমূলিদের বদান্যতায়, এরা কেউই বৈধ নাগরিক নয়।

অথচ এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী অপরাধ-প্রবণ রোহিঙ্গাদের ভারতে জাঁকিয়ে বসার ব্যাপারে কংগ্রেস ও তাদের ধামাধরা বামপন্থী প্রগতিশীলের দল মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকে। এদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি রোহিঙ্গাদের অতিথি হিসাবে, এবং মানবিকতার খাতিরে আশ্রয় দেওয়া উচিত বলে ঘোষণা করে। এদের ভণ্ডামি অবাক করার মতো। কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের যখন তাদের হাজার বছরের বাসভূমি কেড়ে নিয়ে অকথ্য অত্যাচার করে বিতাড়িত করা হয়, তখন এইসব প্রগতিশীল সেকুলারবাদীরা দেখেও না দেখার, জেনেও না জানার ভান করে থাকে কেন?

গুরু মহারাজ প্রণবানন্দজীর কথায় হিন্দুর সব আছে, নেই শুধু একতা। আজ এই বিপন্ন সময়ে হিন্দুর ঐক্যবদ্ধ হবার সময় এসেছে। এছাড়া বাঁচার আর কোনও উপায় নেই।

■

চিঠিপত্র

অপরিপক্ক রাহুল

সম্প্রতি লন্ডনে রাহুল গান্ধী পৃথিবীর বৃহত্তম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আরএসএস-কে, 'আরব বিশ্বের কুখ্যাত কট্টর জঙ্গিগোষ্ঠী মুসলিম ব্রাদারহুডের' সঙ্গে তুলনা করে নিজের ওজন কতটা আর একবার বুঝিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পক্ষের বাজনদাররা ধন্যধন্য করে বাজনায় তাল ঠুকতে আরম্ভ করে দিলেন। ভারতবর্ষ ভাগ্য করে এমন এক ওজনদার ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছে যিনি আবার ভারতের মতো একশো ত্রিশ কোটির দেশে প্রধানমন্ত্রী পদের স্বঘোষিত দাবিদার। কিছু বাজারি পত্রপত্রিকা রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক পরিপক্কতার শংসাপত্র নিয়ে বসে আছে আগামী লোকসভায় তা বিলি করবে বলে। রাহুল গান্ধী কথায় কথায় বলে থাকেন দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট আরএসএস-এর নিকট আমাকে নিতে হবে না। আমার গোটা পরিবার দেশহিতে বলিপ্রদত্ত। এই প্রসঙ্গে বলি, বেশি দিনকার খবর নয় ২০১৬-র ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এক প্রথম সারির পত্রিকার প্রতিবেদন 'জেএনইউ : রাস্তায় নামলেন হাজার হাজার পড়ুয়া, পা মিলালেন রাহুল, কেজরিওয়ালরাও'। খবরের কেন্দ্রবিন্দু ছিল জেএনইউ-র বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের পক্ষ থেকে দলিত ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যার প্রতিবাদ মিছিল এবং সেখানে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' এবং 'কাশ্মীরি আজাদের' স্লোগান প্রসঙ্গ আসার কারণে জাতীয়তাবাদী ছাত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে একটা কেন্দ্রশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তখনকার ওজনদার কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাস্তায় নেমে পড়লেন। কাশ্মীর এবং পাকিস্তান এই দুটি সংবেদনশীল ইস্যু কার হাতে তৈরি এই সম্যক বোধের যার অভাব সে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার খোয়াব দেখতে পারে বৈকি!

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

সংখ্যাগুরু তোষণ

এবার মনে হয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়ার টনক কিছুটা হলেও নড়েছে। গদিতে বসার পর থেকে উনি এমন ব্যবহার রাজ্যবাসীর একাংশের সঙ্গে করে চলেছিলেন তাতে মনে হয়েছিল উনি বোধহয় হালফিল বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে সাইকেল প্রদান, মসজিদের ইমামদের ভাতা প্রদান, কলকাতায় হজযাত্রীদের হজ টাওয়ার, টিপুসুলতান মসজিদের চরম সাম্প্রদায়িক ও হিন্দুবিরোধী ইমামের সঙ্গে মাখামাখি। পরে অবশ্য সাইকেল প্রদানের ভুল বুঝতে পেরে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মতো সকলকে বিপুল অর্থ ব্যয় করে সাইকেল প্রদান। বিষ মদ খেয়ে মরে গেলে সেই পরিবারকে দু' লক্ষ করে টাকা দান। নিজ অনুকূলে রাজ্যের যুবসমাজকে টানার জন্য দু'খেপে ২ লাখ + ১ লাখ করে টাকা অনুদান। এবার আবার দুর্গাপূজার জন্য কলকাতা ও রাজ্যের ২৮ হাজার পুজোকে ১০ হাজার টাকা করে দান। শুধু তাই নয়, ফায়ার লাইসেন্স ছাড় আর রাতকে দিনের আলো করে রাখা বিদ্যুৎ বিলেও ছাড়।

প্রশ্ন একটাই, উনি এতো টাকা পাচ্ছেন কোথা থেকে? রাজ্যে উন্নয়নের টাকা নেই কোষাগারে। ব্রিজ ভেঙে পড়ছে, এই ব্রিজ কার আমলে হয়েছে সেই ধুয়ো তুলে পাশ কাটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছেন। মাঝে মাঝে জনগণের মনে হয় অনেকের তো অনেক পোষা জীবজন্তু থাকে উনিও মনে হয় গৌরী সেন নামক জীবটিকে কোষাগারে রেখে দিয়েছেন। অবশ্য প্রবাদের গৌরী সেন যদি পরজন্মে নারদা সারদার রূপ ধরে ওনার কাছে এসে থাকে তাহলে অবশ্য জনগণের কিছু বলার নেই। কারণ জনগণ বলে থাকে তারা আদার ব্যাপারী তাদের জাহাজের খোঁজে তো প্রয়োজন নেই।

ওনার প্রভাবে কোষাগার শূন্য তা সত্ত্বেও দুহাতে অন্যান্য ভাবে টাকা ওড়ানোতে মনে পড়ে যায় একটা প্রবাদ— বউ বেচে ছেলের বিবাহ দেওয়া। আর একটা বলা যায় মাননীয়াকে উনি যেভাবে মোনাজাত করে নামাজ পড়ার ভঙ্গিমা করছেন, ইফতার করেছেন, এরপর হিন্দু তোষণ করার নামে, অর্থাৎ দুর্গাপূজায় অর্থের দিক থেকে নয়ছয় করে চলেছেন। এসব করলে গোপনে করবেন নাহলে দুষ্টু সাংবাদিকগণ দেখতে পেলে সংবাদপত্রে ছাপিয়ে দেবে আর তাহলেই ব্যস সংখ্যালঘুরা ইমামরা, শাহরুখ খান, ফিরহাদ হাকিম, রেজ্জাক মোল্লা এরা সকলেই ক্ষুব্ধ হবে এবং তার ফলে সেটা ইভিএম-এ বিরূপ প্রতিফলন পড়বে না সেটাই বা কে বলতে পারে। তাই তো এবার পূজায় গৌরী সেনের (পড়তে হবে সারদা, নারদার) টাকায় পুজো কমিটিগুলোকে কিনতে চাইছেন হিন্দু তোষণের নামে। সব জলে যাবে।

ম্যাডাম, আপনার স্বরূপ চিনতে আর কারও বাকি নেই। আপনি যে একজন সুবিধাবাদী, চেয়ারের প্রতি ক্ষমতালোভী হিটলারি মনোভাবাপন্ন, সেকথা পশ্চিমবঙ্গের দুধের শিশুটিও জেনে ফেলেছে।

তাই বলি কি রাজ্যটার তো হাতির বেল খাওয়া করে কোষাগার ফাঁকা করে তালা মেরে দিয়েছেন। এবার মহান ভারতের দিল্লির মসনদের উদ্দেশে বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার মতো ধৃষ্টতা কি না দেখালেই নয়?

যে চেয়ারে লালবাহাদুর শাস্ত্রীজী বসেছেন, বাজপেয়ীজী বসেছেন আর বর্তমানে মোদীজী অধিষ্ঠিত আছেন, তাতে আপনার মতো চরিত্রের ব্যক্তি বসলে লালবাহাদুর ও অটলবিহারীর আত্মা কষ্ট পাবে। দোহাই ম্যাডাম ওটা করবেন না। ভাইপোকে নিয়ে নবান্নেই থাকুন। জয় হিন্দ।

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী।

পরাক্রম পরব

গত ২৮, ২৯ সেপ্টেম্বর পালিত হলো 'পরাক্রম পরব'। ২০১৬ সালে পাকিস্তানের উপর ভারতীয় সেনা বাহিনীর কম্যান্ডোরা যে নিখুঁত 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' করেছিল তাকে স্মরণ করার জন্য। ২০১৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর জম্মু-কাশ্মীরের 'উড়ি'তে ভারতীয় সেনা ছাউনিতে পাকিস্তানি উগ্রপন্থীদের হামলার বদলা হিসাবেই ওই বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর রাত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কম্যান্ডো বাহিনী নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করে প্রায় তিন

কিলোমিটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নিখুঁতভাবে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' করে উগ্রপন্থীদের চারটে শিবিরকে ধুলিসাৎ করে সবাই অক্ষত শরীরে ফিরে আসেন। উগ্রপন্থী ও তাদের মদতদাতা পাকিস্তানি সেনা-সহ প্রায় ৪৫ জনকে নিকেশ করা হয় সেই অভিযানে।

এর আগে ২০০৮ সালের ২৬/১১-তে পাকিস্তানি উগ্রপন্থীরা আরও ভয়ানক আক্রমণ করেছিল মুম্বইতে যা সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তখনকার ইউপিএ সরকার ঘটনার প্রমাণপত্র চালাচালি করে এটা যে পাকিস্তানের কাজ তা প্রমাণ করার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই করেনি। জিহাদি শক্তিদ্বারা পরিচালিত পাকিস্তানও যথারীতি জিহাদি কৌশলে এর দায় স্বীকার করেনি। কিন্তু ২০১৬-র ব্যাপার আলাদা। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। ভারতীয় সেনা বাহিনীর 'সার্জেন্ট-স্বরূপ' কম্যান্ডোরা নিখুঁত অপারেশন করে 'ক্যান্সার-স্বরূপ' উগ্রপন্থীদের 'লঞ্চিংপ্যাড'গুলো গুঁড়িয়ে দিলেন। জাতীয়তাবাদী অধিকাংশ ভারতবাসী সরকারের এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে খুশি হলো ; সেনাবাহিনীর কাজে গৌরব অনুভব করল। কিন্তু দেখা গেল এক শ্রেণীর ভণ্ড দেশহিতৈষী রাজনৈতিক নেতা এবং ভণ্ড সেকুলার বুদ্ধিজীবী 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক'-এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন খাড়া করে কাগজেপত্রে, টিভিতে ভয়ানক হুলুস্থুলু ফেলে দিলেন। মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সভাপতি তো বাক্‌স্বাধীনতার চূড়ান্ত অপপ্রয়োগ করে সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন করে মুখচোখ বিকৃত করে বিবৃতি দিলেন— এটা 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' নয়; এটা 'ফর্জিক্যাল স্ট্রাইক' অর্থাৎ মিথ্যা বানানো গল্প। এতে যে দেশের গৌরব নষ্ট হচ্ছে, দেশের সেনাবাহিনীর মনোবলের উপর আঘাত আসছে এবং শত্রুদেশ পাকিস্তানের হাত শক্ত হচ্ছে সেটা এরা ভাবেন না। এতে স্বাভাবিক কারণেই অধিকাংশ দেশবাসী দুঃখিত ও অপমানিতবোধ করেছেন। এঁদের দেশ-বিরোধী বললে এইসব দিগ্‌গজরা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হন। এঁরা ভাবেন দেশের সব লোক এঁদের সঙ্গে আছে এবং এদের কথাতেই ওঠা বসা করে। বাক্‌স্বাধীনতার নামে যা কিছু বলার লাইসেন্স এঁদের আছে। গণতান্ত্রিক অধিকারের নামে যা খুশি এঁরা করতে পারেন। তাতে দেশ বরবাদ হয় হোক, এঁদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ হলেই হলো।

কিন্তু এখন তো ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের 'ভিডিয়ো' প্রকাশ করা হয়েছে। দেশের প্রায় সব টিভিতে প্রচার করা হয়েছে। এখন এইসব নির্লজ্জ ভণ্ড দেশহিতৈষীদের ক্ষমা চাওয়া উচিত। এই নির্লজ্জ কান কাটাদের কাছ থেকে অবশ্য এইরকম মনুষ্য-সুলভ ভদ্রতা ও সৌজন্য আশা করা বৃথা। এইসব ভণ্ডরা অন্য একটি অজুহাতে আবার চেঁচামেচি আরম্ভ করেছেন। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতে যে 'গৌরব পরব' পালন করা হচ্ছে সেটা এদের সহ্য হচ্ছে না। এরা বলতে আরম্ভ করেছে সেনাবাহিনীকে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করছেন— এটা অত্যন্ত অনৈতিক কাজ ইত্যাদি। কথায় আছে— 'দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না'। এদের ক্ষেত্রেও এই কথাটা প্রযোজ্য।

—প্রণব দত্ত মজুমদার,
কলকাতা-৪৮।

বৈপরীত্য

'সঙ্ঘ' ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে শুধু নয়, তাকে জাগরূপ রাখতে, তাকে স্মরণ, মনন, উজ্জীবন ও প্রসারণ করতে নিত্য প্রয়াস করে আসছে।

'মহালয়া'— হিন্দু শাস্ত্রমতে, পরলোকগত পূর্বপুরুষগণ, পিতৃপক্ষের শুরুতে মর্ত্যে নেমে আসেন উত্তর পুরুষের কাছে জল ও খাদ্য পাওয়ার আশায়। তাই, পিতৃপক্ষের শুরুতে, (কৃষ্ণা প্রতিপদ) থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত শাস্ত্রে তর্পণ করার (পরলোকগতদের উদ্দেশে জল দান) নির্দেশ আছে। অনেকেই তা পালন করেন। আর যাঁরা নানা চাপে প্রতিদিন করতে পারেন না শেষ দিন অমাবস্যা (মহালয়া)-র দিন শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি সম্পন্ন করেন এই বলে—

''আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতামহাদয়ঃ।।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাশিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনশ্ত্রয়ম্।।''
''যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবঃ।
তে তৃপ্তিমখিলং যান্তু—যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ।।''
''আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যন্তু।''

অথচ গত বছর (২০১৭) সালে ওই মহালয়া দিন 'মেদিনীপুর' বিভাগের ১০০ জন সঙ্ঘ কার্যকর্তাকে মেদিনীপুরে (পশ্চিম) ডেকে সারাদিন বৈঠক হয়, যেখানে অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা-সহ প্রান্তের কার্যবাহ জিষ্ণু বসুও উপস্থিত ছিলেন। এখন আমার প্রশ্ন ওই বিশেষ দিনটিকে বৈঠকের জন্য বাছা কি ঠিক হয়েছে? না ওই সব বৈঠকে যোগদানকারীদের পবিত্র তর্পণ থেকে সরিয়ে রাখা ঠিক হয়েছে?

—অনিল কুমার গোস্বামী,
তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর।



সপ্তমীর দুপুরে হেমন্তের ব্যারিটোন

সন্দীপ চক্রবর্তী



'শচীন কত্তার পোলাডা কী করত্যাসে কও তো! এটা কোনও গান হইল? পূজার গান কখনও এমন হয়?' বক্তা পিন্টুদা। স্থান হাওড়ার একটি বিখ্যাত ক্লাবের পুজোমণ্ডপ। অভিযুক্ত রাহুলদেব বর্মন। আর যে গানটি নিয়ে অভিযোগ তার প্রথম লাইন : একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও, তাতে আগুন পাবে।...

সময়টা আশির দশকের মাঝামাঝি। আমরা তখন সবে একটু আধটু ফ্যাশন করতে শিখেছি। চুলে বিশেষ ছাঁট এসেছে। আশির দশকের নিজস্ব আবিষ্কার ব্যাগিজ শার্ট আর প্যান্ট নিয়ে বিভোর হয়ে আছি। কিন্তু পুরনো কিছু জিনিস তখনও রয়ে গেছে। তার মধ্যে প্রধান পুজোর সাহিত্য এবং পুজোর গান। সে সময় পুজোর গান নিয়ে বাঙ্গালির উন্মাদনা এমনই ছিল যে মাঝেমাঝেই পক্ষে বিপক্ষের দুই দলে ঝগড়াঝাটি হয়ে যেত। তেমনই এক ঝগড়ার প্রসঙ্গ দিয়ে এই লেখা শুরু করেছি। যাই হোক, আবার সেই প্রসঙ্গে ফেরা যাক। পিন্টুদার বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ামাত্র এসে হাজির হলেন নন্তুদা। দুজনেই বাঙাল এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কিন্তু নন্তুদা পিন্টুদার মতো প্রাচীনপন্থী নন। এক চামচ গোপাল জরদা মুখে চালান করে নন্তুদা বললেন, 'যা জানস না তাই লইয়া কথা কস ক্যান? শচীনকত্তার পোলা ভুলডা কী কইরল? বছরের পর বছর একরকম গান হইব নাকি?' ব্যস, লেগে গেল ধুন্ধুমার! সেবার দু'জনে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেননি। এমনকী নবমীর দুপুরে সকলে মিলে পাত পেড়ে ভূরিভোজনের যে প্রথা আমাদের পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, সেবার দুই বন্ধু সেখানেও গোমরামুখে বসেছিলেন। চারটে লেডিকেনি বেশি দিয়েও পিন্টুদার মুখে কথা ফোটানো যায়নি। মজার ব্যাপার হলো এই ঘটনার কয়েক বছর পর পিন্টুদা স্বীকার করেছিলেন, 'আমার ভুল হইসিল বোঝলা। নন্তুই ঠিক। মায়ের মুখখান যেমন প্রত্যেকবার নতুন লাগে, গানকেও তো তেমন হইতে হইব। তার জন্য এক্সপেরিমেন্ট চাই।'

তখনকার বাঙ্গালি গান বুঝত। গানের কম্পোজিশন নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কদর করত। হ্যাঁ, পিন্টুদার মতো কেউ কেউ ছিলেন যাদের ঘুম ধাক্কা খাওয়ার পর ভাঙত। কিন্তু ভাঙত। না ভাঙলে বাংলা গানের ক্যানভাসে আমরা এত ভিন্নমুখী সুরকারদের পেতাম না। একবার ভাবুন তো শ্রোতারা কতটা সমঝদার হলে একটি আঞ্চলিক ভাষার গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ, শচীনদেব বর্মন, সুধীরলাল চক্রবর্তী, সুধীন দাশগুপ্ত, রাহুলদেব বর্মনের মতো বিচিত্র মননের সুরকার থাকা সম্ভব? এরা প্রত্যেকেই এক-একটি পৃথক স্টাইলের স্রষ্টা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানে শ্রোতা যদি রাবীন্দ্রিক রোম্যান্টিকতা খুঁজে পান, তাহলে সলিল চৌধুরীর গানে পাবেন পূর্ব ইউরোপের হারমনি। শচীনদেব বর্মনের গানে যেখানে ভাওয়াইয়া- ভাটিয়ালির পিছুটান, রাহুলদেবের গানে যেখানে লোকগান-ভাঙা নতুন মেলোডির উদ্ভাস। এ এক অপূর্ব ঐকতান। যার চরম সিদ্ধিলাভ পুজোর গানে।

পুজোর গান বস্তুটি কী? পুজোর সময় প্রকাশিত হতো বলেই কি এমন নাম? না পাঠক, ব্যাপারটা সম্ভবত সেরকম নয়। যতই এক্সপেরিমেন্ট করুন, পঞ্চাশ ষাট সত্তর এবং আশির দশকের শিল্পী- সুরকার-গীতিকাররা জানতেন, দুর্গাপুজো বাঙ্গালির

অনাবিল আনন্দের উৎস। সেই আনন্দ জীবনের সুখদুঃখ মিলিয়ে এক সম্পূর্ণতার আনন্দ। সুতরাং পুজোর গানে সেই আনন্দের সুর থাকতেই হবে। পুজোর গান যেন শরতের নীল আকাশ, সোনালি রোদ্দুর আর গ্রামবাঙ্গলার নদীর পাড়ে থোকায় থোকায় ফুটে থাকা কাশফুলের সঙ্গে মিলে যেতে পারে। মোদ্দা কথা শুধু গান নয়, পুজোর গান মানে বাঙ্গালির সারা বছরের অপমান-লাঞ্ছনা পেরিয়ে হয়ে ওঠার গান।

১৯১৪ সালে প্রথম গ্রামোফোন কোম্পানি পুজোর রেকর্ড প্রকাশ করে। তখন রেকর্ডের কভারে লেখা থাকত, 'শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে'। রেকর্ড হতো দুই রঙের— বেগুনি এবং কালো। বেগুনি রঙের রেকর্ডের দাম ছিল তিন টাকা বারো আনা আর কালো রঙের রেকর্ডের দাম তিন টাকা। রেকর্ডের কভারের ছবিটিও অসাধারণ। দুটি পাহাড়চূড়ার মাঝখানে উদীয়মান সূর্য। তার সামনে একটা লেক। লেকের চারপাশে কাশফুলের মেলা আর ডানদিকের নীচের কোণে পুষ্পাঞ্জলি দেবার ভঙ্গিমায় এক নারী। বিংশশতাব্দীর সেই ভোরবেলায় কাদের গান রেকর্ড করা হতো? নামগুলো বললে অনেকেরই মনে পড়বে যেমন— মানদাসুন্দরী দাসী, নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কে. মল্লিক, বেদানা দাসী, মিস দাস, কৃষ্ণধামিনী, মালতীমালা দাসী, সরলাবাই, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এর মধ্যে মিস দাস অর্থাৎ অমলা দাস ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বোন। তিনিই ছিলেন প্রথম ভদ্র পরিবার থেকে আসা মহিলা যার গান গ্রামোফোন কোম্পানি রেকর্ড করেছিল।

কুড়ি তিরিশ এবং চল্লিশের দশকে বাংলা গান তার চিরাচরিত রাগ-রাগিনী নির্ভর কালোয়াতি মেজাজ ছেড়ে কাব্যসংগীতের অঙ্গনে প্রবেশ করল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গান পুজোর গান হিসেবে রেকর্ড করলেন সে যুগের প্রবাদপ্রতিম শিল্পীরা। সে যুগে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং জাতীয়তাবোধের ছাপ পড়ল পুজোর গানে। আমরা পেলাম পঙ্কজকুমার মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম. এন. ঘোষ, ইন্দুবালা দেবী, আঙুরবালা দেবী, কমলা ঝরিয়া এবং শচীন দেববর্মনের মতো শিল্পীদের। ততদিনে রেডিওতে শুরু হয়েছে মহিষাসুরমর্দিনী। মহালয়ার ভোরে বাঙ্গালির কানে আছড়ে পড়ছে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সম্মোহনী কণ্ঠস্বর। কিন্তু তখনও বাংলা গানের ষোলোকলা পূর্ণ হয়নি। যার সূত্রপাত ঘটল চল্লিশের দশকের শেষে, এক নবীন কণ্ঠস্বরের উদ্‌বোধনে। তিনি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বাংলা গানের ছোট্ট আঙ্গিনায় একে একে জড়ো হলেন সলিল চৌধুরী, নচিকেতা ঘোষ, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়রা। শুরু হলো বাংলা গানের স্বর্ণযুগ।

পুজোর সময় কী সব গান হয়েছে তখন! সুধীরলাল চক্রবর্তীর গলায় 'মধুর আমার মায়ের হাসি' শুনে চোখে জল আসেনি এমন বাঙ্গালি বিরল। কিংবা অখিলবন্ধু ঘোষের 'ও দয়াল বিচার করো।' ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের আধুনিক গানে ছিল রোম্যান্টিক আকুলতা, কিন্তু শ্যামাসংগীতে ভক্ত-সাধকের আত্মসমর্পণ। আবার তার সুযোগ্য সহোদর পান্নালাল ভট্টাচার্য শুধুই মায়ের ছেলে। তাঁর 'তুই নাকি মা দয়াময়ী'-তে যে অভিমানের স্বাদ পাই তা প্রথাগত শ্যামাসংগীত শিল্পীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। একই কথা প্রযোজ্য বাঙ্গলার কিছু লোকগায়কদের ক্ষেত্রেও। উদাহরণ নির্মলেন্দু চৌধুরী, অংশুমান রায়, স্বপ্না চক্রবর্তী। নির্মলেন্দুর 'সুহাগ চাঁদবদনী' বা অংশুমানের 'সাঁঝে ফোটে ঝিঙ্গাফুল সকালে মলিন গো'— আধুনিক রোম্যান্টিক গানের উজ্জ্বলতম উদাহরণ। স্বপ্না চক্রবর্তীর 'বড়লোকের বিটি লো'-র দুপুরের আলোছায়া ভরা সুর নাগরিক মনকেও দুলিয়ে দিয়ে যায়।

স্বর্ণযুগের বাংলা গানে তিন গায়কের উপস্থিতি সর্বাগ্রে। হেমন্ত, মান্না, কিশোর। পঞ্চাশের দশকে রানার, পালকির গান, অবাক পৃথিবী দিয়ে বেসিক ডিস্কে হেমন্তর জয়যাত্রা শুরু। তারপর অজস্র গান প্রকাশিত হয়েছে। 'কতদিন পরে এলে', 'তার আর পর নেই', 'এই বালুকাবেলায় আমি দেখেছিনু'।... লিস্ট করতে বসলে তল পাওয়া যাবে না। বলা যেতে পারে হেমন্তের ব্যারিটোন বাদ দিয়ে এই সেদিনও বাঙ্গালির পুজো ছিল অসম্পূর্ণ। হেমন্তর পর মান্না দে। তারপর কিশোর কুমার। কত গানের কথা লিখব। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ের কথা। সেবার মান্নার পুজোর গান 'যখন কেউ আমাকে পাগল বলে' মারকাটারি হিট। মনে আছে, প্রেমিকার থেকে সদ্য বিচ্ছিন্ন এক প্রেমিক ঘর অন্ধকার করে গানটা শুনতেন। তাঁর বিশ্বাস কখনও কখনও চোখের জল কাউকে দেখানো যায় না। চোখের জলের কথা কাউকে বলাও যায় না। তিনি যে মান্না দে-র গানের ভক্ত হবেন সেটা খুবই স্বাভাবিক। তখনকার গান মানুষের নিভৃত মুহূর্তের সঙ্গী হতে পারত। মনে পড়ছে কিশোরকুমারের কথা। আশির দশকের শেষের দিকে কিশোরকুমারের বড়ো হিট, 'আমার পূজার ফুল ভালোবাসা হয়ে গেছে।'... গানটা শুনে আমার এক সহপাঠিনীর মন্তব্য, 'এরকম করে প্রপোজ করতে পারিস না?' না, সেই সহপাঠিনীকে প্রপোজ করা হয়নি। কী করেই বা হবে, আমি তো আর কিশোরকুমার নই।

দুটো গল্প বলে এই লেখা শেষ করব। প্রথমটা শুনেছি কবি ও ছোটোগল্প লেখক মীরা বাগচির কাছে। মীরাদি তখন বছর তেরো-চোদ্দর কিশোরী। সবে কুঁড়ি ফোটানো মেয়েবেলার লক্ষ্মণরেখা পেরিয়ে নিষিদ্ধ জীবন একটু-আধটু উঁকি দিচ্ছে। ঠিক সেই সময় একবার সপ্তমীর দুপুরে কোনও এক পুজোমণ্ডপে একলা বসেছিলেন মীরাদি। হঠাৎ কানে এলো হেমন্তের ব্যারিটোন, 'সেদিন তোমায় দেখেছিলাম ভোরবেলায়।' বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গেলেন মীরাদি। ওর মনে হলো হেমন্ত বোধহয় ওকেই কথাগুলো বলছেন। মনে করার চেষ্টা করলেন কখনও কি ভোরবেলায় তিনি শিউলি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মীরাদির বিয়ে করাই হলো না। করবেন কী করে, অন্য কেউ জীবনে এলে যদি জীবন থেকে ওই ব্যারিটোন হারিয়ে যায়? দ্বিতীয় গল্পটা আমার নিজের। তখন আমার কতই বা বয়েস, বড়োজোর বছর খানেক। খুব দুষ্টু ছিলাম। ঘুমোতে চাইতাম না। মা প্রয়োগ করতেন অব্যর্থ ওষুধ। সুমন কল্যাণপুরের পুজোর গান, 'মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে'। সুরারোপ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মায়ের ওষুধ ব্যর্থ হতো না। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। শিল্পীর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। দেখাও হয়নি কখনও। দেখা হলে বলতাম, 'আপনিও আমার মা। মা ছাড়া কেই বা গান গেয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে পারে? আপনাকে আমি পেয়েছিলাম কোনও এক দুর্গাপুজোয়। পুজোর গানে। আপনি ভালো থাকবেন। আমার প্রণাম নেবেন।' ▮

পুজোর ক'দিন বাঙ্গালি খাবার

নীলাঞ্জনা রায়

রসে বশে বাঙ্গালি। সারা বছর নানা পালা পার্বণের, বিশেষ করে সেরা উৎসব দুর্গা পূজার এক অঙ্গ ভোজন বিলাসিতা।

একদিকে রকমারি মিষ্টান্ন সহ নানা পদে মা দুর্গাকে ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ গ্রহণ, অন্যদিকে খাদ্যরসিক বাঙ্গালির পারিবারিক মিলন আর যেমন খুশি খাওয়া দাওয়ার মাঝেই কাটে সপ্তমী থেকে দশমী।

পুজোর ক'দিন খিচুড়ি ভোগ, সঙ্গে আলুভাজা, বেসন দিয়ে বেগুন ভাজা, শাক বড়ি ও নারকেল ভাজা। শুক্তো, এঁচোড় ডালনা, মোচা ও পালংশাকের ঘণ্ট, ফুলকপির কালিয়া ইত্যাদি সবজির নানা পদ। সঙ্গে থাকে লোভনীয় চালতার চাটনি, খেজুর আমসত্ত্ব চাটনি, আনারস চাটনি।

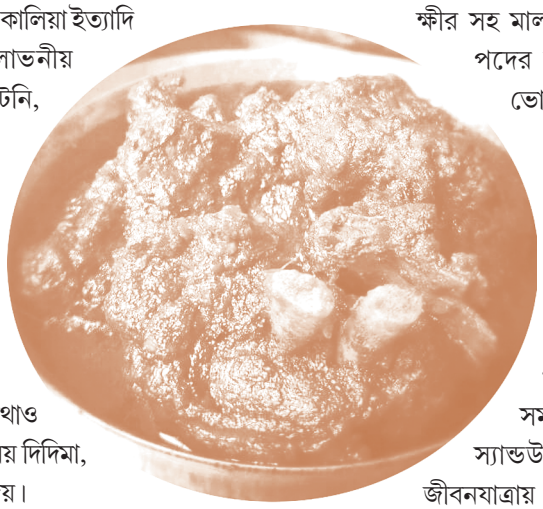

পরমান্নের সঙ্গে কলার বড়া, দই, ক্ষীর সবই থাকে মায়ের ভোগে। তবক দেওয়া বেনারসি পানের বদলে বাড়ির মেয়ে-বৌদের হাতের সাজা ভোগের থালার খিলি পানের স্বাদও অনেক পুরোনো স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

এখনও এই পুজোর ক'দিনই কোথাও দেখা মেলে 'গয়না বড়ির'। যা এক সময় দিদিমা, ঠাকুমার হাতের নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

দশমীর পান্তা, ছাঁচি কুমড়োর, কচুর ঘ্যাঁটের স্বাদ সারা বছরে একটি দিনেই পাওয়া যায়।

আমিষ ভোগ হিসাবেও বাঙ্গালির পাতে পড়ে ইলিশ মাছের ঝাল, অম্বল, চিংড়ি ও ভেটকি মাছের কালিয়া। মাংসের পদও অপ্রতুল নয়।

নৈবেদ্যর প্রসাদের ফলমূলের সঙ্গে থাকে নারকেল নাড়ু, চন্দ্রপুলি ও ক্ষীরের ছাঁচ। নাড়ু চন্দ্রপুলি তৈরির নারকেল কোরা, তার সঙ্গে গুড় ও চিনির পাকের সুগন্ধ জানান দেয় পুজো এল। শিশুরাও পুজোর কদিন চকোলেট, চিপসের বদলে নাড়ু, চন্দ্রপুলিতেই খুশি থাকে। সাদা ময়দার ফুলকো লুচি বা মুগডালের কচুরি, সাদা আলুর তরকারি সহ বোঁদে, পান্তুয়া, চমচম না থাকলে পুজোর সকালে জলখাবার হয় না।

পুজোর কয়েকটি দিন শহরের নামি-দামি হোটেল, রেস্টুরেন্টেও থাকে বাঙ্গালি খাবারের এলাহি আয়োজন। পোলাও, কষা মাংস, ডাব চিংড়ি, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, কলাপাতার মোড়কে ভেটকির পাতুরি, কবিরাজি কাটলেট, দই বেগুন, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, ধোঁকার ডালনা, টমেটোর চাটনি। শেষ পাতে ক্ষীর সহ মালপো, অমৃতি, মিষ্টি দই— এমনই পদের সমাহারে থাকে মধ্যাহ্ন ও রাত্রি ভোজনের আকর্ষণ।

বাঙ্গালি খাবারের পশরা নিয়ে উপস্থিত থাকে বারোয়ারি পুজো প্যান্ডেলের সংলগ্ন দোকানগুলিও। রাধাবল্লভি, আলুরদম, মাছের চপ, মাংসের ঘুঘনি, রাবড়ি, রসমালাই, পুলি পিঠে সহযোগে চলে প্যান্ডেলের আড্ডা। বছরের অন্য সময় এগরোল, চাউমিন, বার্গার আর স্যান্ডউইচে ফাস্টফুড কর্নারগুলি ব্যস্ত জীবনযাত্রায় ক্লান্ত মানুষদের খিদে মেটালেও, বাঙ্গালি রান্নার আবেদন সর্বকালের।

তাই পুজোর ছুটির অবকাশে উৎসবে মেতে ওঠা বঙ্গের মানুষ খাদ্য তালিকায় বেশি করে পেতে চায় প্রায় বিস্মৃত হয়ে যাওয়া পদগুলি।

দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ভুলে, আনন্দে, হাসিতে, আলোতে আর মনের মতন বাংলার খাবারে রসনাতৃপ্ত করবে বলে বাঙ্গালি আনন্দময়ী দশভুজার আগমনের এই দিনক'টির প্রতীক্ষায় থাকে সারা বছর।





দুর্গাপূজায় মেয়েরা বড়ো ভূমিকা পালন করে থাকে

গার্গী মণ্ডল

দুর্গাপুজো বাঙ্গালি হিন্দুদের কাছে একটি শ্রেষ্ঠ মহোৎসব। দুর্গাপুজোয় মূল আচার অনুষ্ঠানে যেগুলো পালন করা হয় সাধারণত সেগুলোই স্ত্রী-আচার নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি স্ত্রী-আচারেরই বিশেষ তাৎপর্য আছে। মহালয়ার রাতেই পিতৃপক্ষ শেষ হয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হয়। আর সেদিন থেকেই শুরু হয়ে যায় দুর্গাপূজার সমস্ত রকম স্ত্রী-আচার অনুষ্ঠান। মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় মহাষষ্ঠী বা দুর্গা ষষ্ঠী থেকে। সন্ধ্যাবেলায় দেবীর অধিবাস হয়। দেবী প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করে দেবীকে বরণ করা হয়। তারপর শুরু হয় বোধন ও অধিবাস।

পরদিন সপ্তমীর ভোরে প্রথমেই কলাবউ স্নান করানো হয়। তারপর শুরু হয় নবপত্রিকা স্থাপনের পালা। নবপত্রিকা স্থাপন করতে ৯ রকমের গাছ বা গাছের শাখা প্রয়োজন হয়। ১. কলাগাছ, ২. কালোকচু গাছ, ৩. হরিদ্রা গাছ, ৪. মানকচু গাছ, ৫. জয়ন্তী গাছ, ৬. বেল শাখা, ৭. ডালিম শাখা, ৮. ধান গাছ, ৯. অশোক শাখা। এগুলি একসঙ্গে বেঁধে নবপত্রিকা স্থাপন করে পুজো করা হয়। তারপরে সপ্তমী পুজো। সপ্তমী পুজো শেষে হয় ভোগ ও আরতি। অষ্টমী পুজোতে দেবীর মহাস্নান করানো হয়। বাঙ্গালিরা সাধারণত অষ্টমীর দিনে বিশেষভাবে অঞ্জলি দিয়ে থাকেন। সকাল সকাল স্নান সেরে নতুন কাপড় পরে মা দুর্গার চরণে অঞ্জলি প্রদান করা হয়। মহাষ্টমীর দিনে আরেকটি বিশেষ রীতি পালন করা হয় তাহলো কুমারী পুজো। যেসব বালিকা এখনো বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছয়নি তাদের দেবী রূপে পূজা করা হয়। কুমারীকে দেবীরূপে সাজানোর কাজটি করেন মায়েরা। মহাষ্টমীর দিন বিশেষ ভোগ প্রদান করা হয় দেবীকে। মহাষ্টমী এবং মহানবমীর সন্ধিক্ষণে হয় সন্ধি পুজো। মহাষ্টমীর শেষ ২৪ মিনিট এবং মহানবমীর শুরুর ২৪ মিনিট সময়ে এই পুজো করা হয়। সন্ধি পুজোর সময় দেবীর বিশেষ ভোগ আরতি ও হোমযজ্ঞ হয়। মহানবমী পুজোতে অষ্টমী পুজোর মতোই অঞ্জলি দেবার ভিড় থাকে। নবমী পূজা শেষেও হোমযজ্ঞ হয়। দশমী পুজোতে দশোপচারে দেবীর পুজো করা হয়। অপরাজিতা পুজোও দশমীর দিনে হয়ে থাকে। পুজো শেষে দেবীর ঘট বিসর্জন করা হয়।

ঘট বিসর্জনের পরেই হয় বিজয়া দশমীর একটি বড়ো অঙ্গ সিঁদুর খেলা। বিবাহিত মহিলারা মা দুর্গাকে মিষ্টি খাইয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে নিজেরাও পরস্পরকে সিঁদুর মাখিয়ে থাকে। বড়দের প্রণাম ও ছোটোদের আশীর্বাদ দিয়ে তার সঙ্গে মিষ্টিমুখ করে বিজয়া করা হয়। রাতে দেবীর প্রতিমা গঙ্গা ঘাট প্রদক্ষিণ করে জলে ভাসিয়ে বিসর্জন করা হয়। দুর্গা পুজোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মায়েরা একটা বড়ো ভূমিকা পালন করে থাকে। ▮

প্রবাসে দুর্গাপূজা মানে শিকড়ের সঙ্গে পরিচয়

সারদা সরকার

এখানে আকাশে তুলতুলে মেঘ নেই। এলোমেলো করে দেওয়া আশ্বিনের আলো নেই। প্যান্ডেলের বাইরে ত্রিপল বাঁশের জঙ্গলে হুড়মুড়িয়ে হারিয়ে যাওয়ার সুখ নেই। শিউলির নস্টালজিয়া নেই। কলাগাছ মঙ্গলঘট সশীষ ডাবের মাথায় লাইনবন্দি শোলার কদমফুল নেই। বরং লন্ডনের সারাবছরের মেঘলা আকাশে আজও উথালপাথাল বৃষ্টি। স্কুল কলেজ আপিস কাছারি পুরোদস্তুর খোলা। তা সত্ত্বেও টেমসনগরী আজ আনন্দনগরী। বুকের মাঝে কান পাতলে ড্যাডাং ড্যাডাং ঢাকের বাদ্যি। চোখ বুজলে একশো আট পদ্মমালার অকাল বোধন। সাগরপারের বাঙ্গালির নিজের শিকড় আঁকড়ে থাকার জলছবি মণ্ডপে মণ্ডপে। বাইরের পৃথিবীটাকে অস্বীকার করে বিলেতে ঝলমলে ধোপদুরস্ত কমিউনিটি হলেই লেখা 'জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমনবার্তা'।

আমেরিকান স্টাইলে উইকেন্ডের ক্র্যাশ কোর্সের পুজো তো এখানে হয় না, হয় পাঁজি পুঁথি দিনক্ষণ মেনে। লন্ডনে প্রায় খান চল্লিশকে পুজোর মিল এবং অমিল দুইই আছে। ষাটের দশকে আসা বাঙালি বুকে নিয়ে বেড়ায় সেই সময়ের ফেলে আসা প্রিয় শহরকে, কিন্তু শহর এগিয়ে গেছে ততদিনে আরও পঞ্চাশটি বছর। কিন্তু মানুষগুলো পড়ে আছে ষাটের দশকের কলকাতায়। কনটেম্পোরারি হ্যাপেনিং লন্ডনে তাদের ব্রিটিশ সত্তা বেড়ে উঠেছে, কিন্তু বাঙালি সত্তা থমকে আছে সেই সময়ের কলকাতায়।

হোয়্যাটস অ্যাপে বন্ধুদের গ্রুপে ঠিক হয় বাস বোঝাই করে পুজো হপিং হবে অষ্টমীর দিন। সারাদিন ঝুপঝাপ বৃষ্টি, তবু বাক্স ঝেড়ে বের করা হবে জামদানী, বালুচরী, জুটবেনারসী, পঞ্জাবি, ধাক্কা দেওয়া ধুতি কিংবা অনলাইনে কেনা বিষ্ণুপুর সিল্ক অথবা মুগা তসরের ঝাঁপি। কুচোকাঁচাদের জন্যে দেশ থেকে আনা ইলাস্টিক শাড়ি অথবা প্যান্টের মতো ফোল্ডিং ধুতি। আজকাল বাচ্চাদের হাতে ক্যাপ পিস্তল থাকে না বরং থাকে নানারকমের গ্যাজেট, কনসোল, নতুন থেকে নতুনতর ইলেকট্রনিক গেম-ফ্ল্যাপি বার্ড, হ্যাপি বার্ড, অ্যাংগ্রি হার্ড! যস্মিন দেশে যদাচার! তবু ওদের জন্যেই তো আমাদের এই চেষ্টা। ওরাও জানুক চারপাশের এই ব্রিটিশ আবহাওয়ার বাইরেও একটা পৃথিবী আছে। শিকড়ের সঙ্গে চেনা হোক ওদের। ওরাও শিখুক, জানুক, নিজের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতিকে।

হৈহৈ করতে করতে বাস পৌঁছে যায় লন্ডনের অন্যতম একটি বিখ্যাত পুজোমণ্ডপে। ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকি। পুজোর গন্ধ এসে ছুঁয়ে ফেলে ধূপ, ধুনো, ফুল, চন্দন, নতুন শাড়ি, জামা সব মিলিয়ে মনে হয় না বিলেত। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে মায়ের মুখ! কুমোরটুলি থেকে জাহাজে চেপে হাজির হয়েছেন দুর্গতিনাশিনী! নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকি— অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, টানা টানা চোখ, সুডৌল হাতে ধরা ত্রিশূল, খড়্গ, কৃপাণ চক্র! রূপের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী সাজ! মনে মনে বলি মেয়েদের সবার হাতে এমন শক্তি দিয়ে দাও মা। নরম শরীর হোক না কেন, শক্ত হাতে অস্ত্র ধরতে শিখুক আজকের মেয়েরা। ঢাকের আওয়াজ জোরদার হয়— ডাড্ডা ডাডাং কুড়কুড়াকুড়! সময় বেভুল হয়ে যায়। চেনা পুজো অচেনা শহর, নাকি চেনা শহরে অচেনা পুজো? ঠাকুরদালানে তখন সারিসারি নারীপুরুষ। মেয়েদের গায়ে গোছা গোছা ঝুমঝুমে গয়না— হার চুড়ি বালা বাউটি, কপালে টিপ, ফর্সা মুখ টকটকে লাল, নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। পুষ্পাঞ্জলির ডাক পড়ে— ক্রিসান্থিমাম, কার্নেশান, মেরিগোল্ড, লিলি, গোলাপ, জিরোনিয়ামের অঞ্জলি। নাই বা রইল অপরাজিতা রজনীগন্ধা বেল জুঁই শিউলি! গঙ্গাজলের বদলে টেমসওয়াটার।

এগিয়ে চলি— বাস এসে দাঁড়ায় সাউথ লন্ডন দুর্গাপুজোর সামনে। অনেক চেনাজানা মানুষকে নিয়ে তৈরি ঘরোয়া এই ক্লাবে এসে মনে হয় নিজের বাড়িতে এসে পড়েছি। কোমর বেঁধে লেগে যাই কাজে। যদিও অকাজেরই মতো সেসব কাজ। একশো আট প্রদীপ জ্বলে, ঢাকের কাঠিতে বিদ্যুৎ! ঘন গম্ভীর সে ঢাকের বোল। রাবণ বধের মুহূর্ত যে! গা ছমছম করতে থাকে। কালো শাড়িতে দুর্গা ঠাকুর এখন চামুণ্ডা! একশো আট পদ্মের অঞ্জলির মন্ত্রপাঠে গায়ে কাঁটা দেয়— কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাসিনী— সন্ধিপুজো, কুমারীপুজো সব একে একে শেষ হয়। তারপর শুরু দেদার আড্ডা। বাঙালি পিএনপিসি কিংবা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবে না এরকম কি হয়? ঢেঁকির ধানভানা শুরু হয়। এরই মধ্যে মনকষাকষি বা মেলামেলি হয়ে যায় অনিবার্যভাবে। গতবছরের বালিকা মেয়েটি কিশোরী হয়ে গিয়েছে, অনভ্যস্ত শাড়িতে সে এখন মায়ের মাথায় মাথায়! গত বছরেও আবৃত্তি করা ছেলেটির এবারে গলার স্বর ভেঙে গেছে, বাবার কোল থেকে নেমে কচিকাঁচারা হুটোপাটি করতে লেগেছে। এটাই তো অবধারিত দৃশ্য।

এভাবে ঘুরতে থাকি ক্যামডেন টাউন হল, বেলসাইজ পার্ক, সনাতন অ্যাসোসিয়েশন। ততক্ষণে দশমী এসে দাঁড়িয়েছে পথ জুড়ে। মেয়ে বৌরা ভিড় করে, হাতে থালায় মিষ্টি, আর সিঁদুরের কৌটো। কপালে, গালে সিঁদুর, কোরা সাদা লালপাড় শাড়িতে ভারি সুন্দর দেখায় মেয়েদের। ঝপাঝপ ফটো উঠতে থাকে চারপাশে আর সে ফটো সোজাসুজি ফেসবুকে আপলোড হয়ে যায়।

(লেখিকা লন্ডন প্রবাসিনী শিক্ষিকা)



লন্ডনের পূজায় প্রবাসী বাঙালি মায়েরা।

দুর্গাপূজা দেশ থেকে দূরে থাকার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়

নিলয় নাথ

ভারতবর্ষের মতো বিদেশেও দুর্গাপুজো হয় তবে একটু অন্যভাবে। বাঙ্গালি থাকে না এমন দেশ পৃথিবীতে বুঝি বিরল। তাই কাছাকাছি থাকা বাঙ্গালিরা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মেতে ওঠে দেবী দুর্গার আরাধনায়। অধীর আগ্রহে প্রবাসী বাঙ্গালিরা অপেক্ষায় থাকি সেই শুভক্ষণের জন্য।

আমেরিকায় স্কুল, কলেজ ও অফিস ছুটি না থাকার কারণে বিভিন্ন পূজা উদ্যোক্তারা সপ্তাহের শেষে শনি ও রবিবার পুজোর আয়োজন করে থাকেন। তাই পাঁচ দিনের পুজোটাকে দু'দিন শনি ও রবিবারে সম্পন্ন করতে হয়। ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী একত্রে শনিবার এবং নবমী ও দশমী রবিবারে হয়। এভাবে পুরো অনুষ্ঠানটিকে ভাগ করা হয়। যেহেতু এখানে নিরাপত্তার ওপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়, তাই সব সমিতি সব শহরে ইচ্ছে থাকলেও পুজো পরিচালনা করতে পারে না। নিকটবর্তী পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে অনুমতি নিতে হয় বিশদ বিবরণ দিয়ে বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই। কিছু পরিচালন সমিতি এই দু'দিনের জন্য স্কুল, থিয়েটার বা বড় হলঘর ভাড়া করে থাকে। সমিতির সদস্যরাই আগেরদিন রাত জেগে উৎসাহের সঙ্গে পূজামণ্ডপ ও প্রতিমা সাজানোতে লেগে পড়ে। কচিকাঁচারাও হাত লাগায়।

বাঙ্গালি পূজা পরিচালন সমিতিগুলো সদস্য ও অতিথিদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পুজোর খরচ নির্বাহ করে। পুজোর সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে আবৃত্তি, গান, নাচ ও নাটক উল্লেখযোগ্য। ধুনুচি নাচ, যেমন খুশি সাজো, গান ও নাচেরও আয়োজন করা হয়। পুরস্কারেরও ব্যবস্থা থাকে বেশ কিছু জায়গায়। কিছু পুজো আয়োজক কলকাতা থেকে নামি দামি ব্যান্ড বা গাইয়ে নিয়ে আসে অনুষ্ঠানকে আরও বেশি আকর্ষনীয় বা জনপ্রিয় করার জন্য। কুপন অনুযায়ী প্রসাদেরও ব্যবস্থা থাকে। এখানেও পূজা, মন্ত্রপাঠ ও অঞ্জলি হয় সময় অনুসারে। এই একটা উৎসবেই সব প্রবাসী হিন্দুদের দেখা যায় একত্রিত হতে।

তবে এদের সবার থেকে আলাদা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের দুর্গাপুজো। ভারতের পঞ্জিকা অনুসারে পাঁচদিনে হয়। সঙ্ঘের মন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজা হয়। প্রতিদিন নিয়ম করে সকাল ও সন্ধ্যায় সঙ্ঘের মহারাজ পুজো করেন। প্রতিদিন সন্ধে সাড়ে ছ'টা থেকে চলে দেবীর পূজা, মন্ত্রপাঠ, ধুনুচি নাচ, সন্ধ্যা আরতি, অঞ্জলি ও শেষে প্রসাদ বিতরণ। মহা-অষ্টমীর দিন এখানে বেশি ভিড় হয় অন্যান্য দিনের চেয়ে। নিউ জার্সির বাঙালিরা প্রতিবছর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে আসে পুজো দেখতে। আমরা প্রবাসী বাঙ্গালিরা এখানে ঠাকুর দেখার আনন্দটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি। এখানকার অন্যান্য মন্দিরেও দুর্গা পুজো হয়। কিন্তু বাঙ্গালির দুর্গাপুজোর মতো নয়। তবে এখানে 'নবরাত্রি' সব মন্দিরগুলিতে ভালো রকম পালিত হয়। গুজরাটি মহিলারা 'গরবা' নাচ করে থাকেন।

এখানকার নামকরা বাঙ্গালি পরিচালন সমিতির মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হলো :

কল্লোল (সোমারসেট, নিউজার্সি), উৎসব (ইস্ট ব্রান্সউইক, নিউজার্সি), আদ্যাপীঠ (দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ— সোমারসেট, নিউজার্সি), গার্ডেন স্টেট পূজা কমিটি (জি এস পি সি— সেন্ট্রাল নিউজার্সি), গার্ডেন স্টেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন (জি এস সি এ— সেন্ট্রাল নিউজার্সি), ইস্ট কোস্ট দুর্গা পূজা অ্যাসোসিয়েশন (ই সি ডি পি এ— কুইন্স্, নিউ ইয়র্ক), নিউ ইয়র্ক পূজা অ্যাসোসিয়েশন (এন ওয়াই পি এ— কুইন্স্, নিউ ইয়র্ক), আনন্দ মন্দির (সোমার সেউ, নিউজার্সি)। এছাড়া অন্যান্য স্টেটের প্রধান শহরগুলিতেও দুর্গা পুজোয় মেতে উঠে বাঙ্গালিরা।

দশমীর দিনে সিঁদুর খেলা এই বিদেশেও অনুষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিজয়া সম্মিলনীও পালিত হয়ে থাকে বেশ কিছু জায়গায়। সব ভারতীয়রাই আসে মন্দিরে পুজো দেখতে। আমেরিকানরাও পুজো দেখতে আসে এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন। এখানে দেশের মতো অত জৌলুস কিংবা প্যান্ডেল বা আলোকসজ্জার সঙ্গে পূজা হয় না বটে, কিন্তু কিছুটা হলেও পুজোর স্বাদটা পাওয়া যায়। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো। বিদেশের মাটিতে দুর্গা পুজোর অনুভূতি কিছুতেই ছোটবেলার দেশের স্মৃতিকে ম্লান করতে পারে না। ছোটবেলায় মা-বাবার হাত ধরে বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে প্যান্ডেলে পুজো পরিক্রমা— এগুলো বিদেশের মাটিতে বসে পাওয়া যায় না। তবুও মন খারাপের মাঝে ঢাকের শব্দ (রেকর্ডেড), ধূপের গন্ধ, কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ ও পূজার মন্ত্রধ্বনি--- দেশ-স্বজন-পরিবার থেকে দূরে থাকার দুঃখ কিছুটা হলেও ভুলিয়ে দেয়।

(লেখক নিউজার্সিতে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার)



নিউজার্সিতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজা।

প্রবাসী জীবনে দুর্গাপূজা যেন এক পরম প্রাপ্তি

প্রবাল চক্রবর্তী

শুনেছি, বাঙালি জন্ম থেকেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত। তাই বোধহয় বাঙালি যে দেশেই গেছে, আইসল্যান্ড হোক কী অস্ট্রেলিয়া, সেখানেই দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছে। কার্তিক মাসে উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত যে মায়ের জয়ডঙ্কা বাজে, সেটা তো এই মা-ন্যাওটা ছেলে-মেয়েদের উদ্যোগেই। তাছাড়া, প্রবাসের দুর্গাপুজোর একটা আলাদা রকম মজা রয়েছে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নেই, শারদ সম্মানও নেই। উদ্যোক্তারা পুজোটাকে নিজের বাড়ির পুজোই মনে করে। আড়ম্বর না থাকুক, আন্তরিকতা যথেষ্টই থাকে।

দেশের মতোই এখানেও দুর্গাপুজো তিনরকমের হয়— বাড়ির পুজো, বারোয়ারি পুজো, আর সার্বজনীন পুজো। প্রবাসীর জীবনে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন ও দুর্গোৎসব দুটোই প্রায় সমার্থক। সিডনিতে বারোটি বাঙালি মিলে চায়ের আড্ডায় বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের পত্তন করেছিল, ১৯৭৪ সালে। পরের বছরই সেখানে শুরু হয় দুর্গাপুজো। মেলবোর্নে বাঙালির অভিযান শুরু আশির দশকে। তিরাশির বিজয়া সম্মিলনীতে মেলবোর্নে বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের শুরু। কলকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে দুর্গাপুজো শুরু ১৯৮৯ সালে।

বিদেশে পুজোর আয়োজন সহজ নয়। দেশে পুজোর মূল কাজগুলো করে পনেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী একদল কচিকাঁচা। আমাদের এখানে অভিবাসী যারা আসে ত্রিশ ছাড়ানোর পরই আসে। অথচ, এখানে কাজ কিন্তু দেশের পুজোর থেকে বেশি। বাসন মাজা থেকে চণ্ডীপাঠ, সবকিছুই উদ্যোক্তাদের করতে হয়। ভাড়া করে লোক আনা খরচসাপেক্ষ, ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে তাহলে।

পুজোর মাসকয়েক আগে থেকে সপ্তাহান্তে বৈঠক শুরু হয়। ঝামেলা কী কম? রাস্তায় প্যান্ডেল বাঁধা চলবে না, পুজোর জন্য একটা বড়োসড়ো সভাগৃহ বুক করতে হয়। মণ্ডপসজ্জা তৈরির পরিকল্পনা, আলো ও শব্দের যন্ত্রপাতি ভাড়ার ব্যবস্থা। প্রসাদি ফল অর্ডার। প্ল্যাস্টিকের থালা, বাটি, গেলাস, চামচ অর্ডার। রাঁধুনি ঠিক করা। দুদিন ধরে জলখাবার, দুপুরের আর রাতের



অস্ট্রেলিয়ায় দুর্গাপূজা।

খাবার সবই পুজোবাড়িতে। সবার খুশিমতো মেনু ঠিক করা। কী কী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, সেসবও ঠিক করা। রীতিমতো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের নিয়মকানুন মেনে কাজ ভাগ হয়, মনিটারিং হয় প্রতি সপ্তাহে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রিহার্সাল শুরু হয়। যে যার দায়িত্বমতো কাজ শুরু করে। এইসব নিয়ে মাঝেমধ্যে ঝগড়াও হয়। সব বাধা পার করে পুজোর দিনগুলো হুড়মুড় করে এসে পড়ে।

ভারতে লোকে দুর্গাপুজোয় ছুটি পায়। আমরা পাই না। তাই পুজোর তিথির আশেপাশে কোনো একটা শনি-রবিবার (ছুটির দিন) বেছে নিয়ে পুজো হয়। পুজোর আগেরদিন শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা শুরু হয় আসল হৈচৈ। একদল যায় ফলের আড়তে, পুজোর ফলের ডেলিভারি নিতে। দু' হাজার ভক্তের জন্য প্রসাদী ফল, সোজা কথা নয়! আরেকদল যায় গুদাম থেকে প্রতিমা ও পুজোর বাসন আনতে। বাকিরা মণ্ডপ সাজাতে লেগে পড়ে। আলো, স্পিকার ও মাইক লাগানো, সাউন্ড মিক্সার টেস্ট করা। ফলফলাদি ধোয়া, তেঁতুল দিয়ে পুজোর বাসন মাজা, পরদিনের ভুজ্যতাংয়ের জন্য চেয়ার-টেবিল পাতা। পাশাপাশি চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ড্রেস রিহার্সাল। এসব শেষ হতে রাত একটা বেজে যায়। মাত্র ক'ঘণ্টার ঘুম। পরদিন শনিবার, সকাল সাতটার মধ্যে আবার সবাই হাজির পুজোর সভাগৃহে। সবার আগে পৌঁছোন পুরোহিতমশাইরা। এঁরা কেউই সেই অর্থে পেশাদার পুরোহিত নন।

শনিবার বোধন। একই দিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধি পুজো। প্রচুর লোকসমাগম হয় পুজোমণ্ডপে। ভিড় সামলাতে হিমশিম খায় ব্যবস্থাপকরা। লাগাতার চণ্ডীপাঠ হয় পাঠ করেন এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রফুল্লমেসো। খিচুড়ি, লাবড়া, চাটনি দিয়ে দ্বিপ্রাহরিক সহভোজ। সন্ধ্যেবেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাইরে থেকে শিল্পী আসে না। স্থানীয়রাই গান গায়, নাচে, কবিতা বলে। একাঙ্ক নাটক, শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ হয়। পরদিন রবিবার হয় নবমী ও দশমীর পুজো। সঙ্গে সিঁদুরখেলা, ধুনুচিনাচ। এখানে ধুনুচিনাচ নাচে মেয়েরা। ছেলেরা ঢাক বাজায়। কল্পনা করুন, একদল মেয়ে সিঁদুর মেখে আগুন হাতে বীরভাবে প্রলয়নাচন নাচছে, সে এক গায়ে কাঁটা দেওয়া দৃশ্য। ঝাড়া তিন ঘণ্টা চলে ধুনুচিনাচ। সবশেষে বিসর্জন। মায়ের মূর্তির বিসর্জন হয় না। ঘট বিসর্জন হয় তার বদলে। প্রতিমা সিন্দুকে ভরে অ্যাসোসিয়েশনের গুদামে রেখে দেওয়া হয়। বৎসরান্তে একই মূর্তিতে আবার পুজো হয়। প্রতি বছর একই প্রতিমায় পুজো হওয়ায় মায়ের মুখটা খুব চেনা হয়ে যায়। স্মৃতিপটে গাঁথা থাকে ছবিটা বারোমাস। মা পূর্ণ হয়ে থাকেন সন্তানের মনে। প্রবাসী জীবনের অনেক হারানোর মাঝে এ যেন এক পরম প্রাপ্তি। এত খাটুনির পর রবিবার রাতে অবধারিত গায়ে ব্যথা। সেও যেন মায়েরই স্নেহের পরশ। তাঁর আশীর্বাদ। আসছে বছর আবার আসার অঙ্গীকার।

(লেখক মেলবোর্নস্থিত বাঙালি)



দুর্গাপুজোয় নারীশক্তির আরাধনা

লকেট চট্টোপাধ্যায়

দুর্গা পূজা এসে গেল। পৃথিবী নতুন আলোয় ঝলমল করছে। বর্ষার মেঘ আর নেই। নীল আকাশে অমল ধবল পাল তুলে নৌকোর মতো ভেসে যাচ্ছে সাদা মেঘ। কোন দিকে ভেসে যাচ্ছে তারা? এক অজানা অচেনা শক্তির দিকে। সোনালি রোদ্দুর, নীল আকাশ, চারধারের এই উৎসব-উৎসবভাব, সমস্তই সেই শক্তির সেলিব্রেশন। সেই শক্তি কিন্তু নারী শক্তি। কেন নারী শক্তির এই আরাধনা? ধরণীকে অশুভ থেকে মুক্ত করার জন্য। সমাজ সংসারকে অন্যায় থেকে বাঁচানোর জন্য। অসুর বা অশুভের নিধন সম্ভব একমাত্র নারীশক্তির জাগৃতির মধ্যে। নারী না থাকলে সম্ভব নয় অশুভের সংহার।

এ হলো ভারতের উপনিষদের কথা। ভারতের পুরাণের কথা। প্রাচীন ভারত নারীকে বসিয়েছিল পূজার আসনে। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন নারীশক্তির জাগরণেই সমাজ সংসার ও সমগ্র দেশের সার্বিক মঙ্গল হতে পারে। দুর্গাপূজা, কালীপূজা সবই নারীশক্তির জাগরণের মন্ত্রে উদ্‌যাপিত। আমরা নারীকে 'শক্তিরূপেন সংস্থিতা'ই বলছি। নারীকে আহ্বান করছি মাতৃরূপে। মাতৃরূপই নারীর পবিত্রতম রূপ। সেই রূপেই নারীকে আমাদের সমাজ ও জীবনের মাঝখানে আহ্বান করি আমরা। হে নারী, শক্তিরূপে আবির্ভূতা হও তুমি। সংহার করো অশুভ শক্তিকে। প্রতিষ্ঠিত করো শুভ ও মাঙ্গলিক শক্তিকে। এই হলো আমাদের প্রার্থনা। কিন্তু প্রাচীন ভারতের এই প্রার্থনা কি সত্য হয়ে উঠেছে? কলুষিত সমাজে সত্যি কি এই প্রার্থনা আমাদের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়? আমরা নারীশক্তি জাগরণের যে মন্ত্র পড়ি, সেই মন্ত্রে কি গাঁথা আছে আমাদের হৃদয়ের বেদনা ও প্রত্যয়? তা যদি থাকত, তাহলে সারাদেশ জুড়ে, ঘরে ঘরে নারীর এই প্রাত্যহিক লাঞ্ছনা আমরা দেখতে পেতাম না।

প্রতিদিন ঘরে ঘরে নারী লাঞ্ছনার প্রতিবেদন আমরা খবরের কাগজে পড়ছি। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে নারীর শরীর। নারীর অপহরণ ও পাচার তো লেগেই আছে। বিবাহে নারীর সম্মান ক্রমাগত অপহৃত। ঘরে ঘরে নারী পণ্যবস্তু। কিংবা একশ্রেণীর পুরুষের সম্পত্তি। আধুনিক বিজ্ঞাপনগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, অনেক বিজ্ঞাপনেই নারী পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত, তার কোনো মন নেই, শুধুই শরীর।

সব থেকে যা দুঃখের তা হলো, আইন যদিও নারীকে দিয়েছে মর্যাদা ও ক্ষমতা এবং বিস্তৃত সামাজিক অধিকার, কিন্তু নারী নিজেই জানে না তার কতখানি ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে। এই না জানার কারণ অধিকাংশ নারীর শিক্ষার অভাব। আমাদের দেশে নারী-বঞ্চনা ও নারী-দুর্গতির প্রধান কারণই হচ্ছে স্ত্রী-শিক্ষার অভাব। আমরা পুত্র-সন্তানদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করি। কিন্তু কন্যা-সন্তানদের শিক্ষার প্রতি আমরা উদাসীন বা অনুৎসাহী। এখনও গ্রামে কন্যাসন্তান মানেই বিয়ে দিয়ে অন্যের ঘাড়ে তার দায়িত্ব অর্পণ। এই মনোভাব, এই প্রবণতা আমাদের যতদিন গ্রাস করে থাকবে, ততদিন আমাদের দেশে নারীশক্তির অভ্যুদয় সম্ভব নয়।

নারীশক্তির মূলে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। ইউরোপ আমেরিকায় নারী অর্জন করেছে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শিক্ষার জোরে, নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সৌজন্যে। আমাদের বঙ্গে নারীশিক্ষা নেই। তাই কাজ নেই। সে শুধুই সংসারের কাজেই সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতা নষ্ট করছে নারীশক্তির প্রকাশ।

নারীশক্তির সার্বিক প্রকাশের জন্য প্রয়োজন নারীশিক্ষা ও পুরুষের পাশাপাশি কাজের প্রসারিত সুযোগ। নারীর হাতে অর্থ না থাকলে তাকে পুরুষের উপর পদে পদে নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হবেই। তাহলে কীভাবে সম্ভব নারীর জাগরণ? নারীশক্তির জাগরণের দুটো পথ— এক, নারীর শিক্ষা। দুই, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। একসঙ্গে পুরুষ ও নারী পাশাপাশি নারীশক্তির জাগৃতির পথে অগ্রসর। নারীকে দিতে হবে শিক্ষা। নারীকে দিতে হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তবেই ঘটবে নারীশক্তির জাগরণ। নারী প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজে, সংসারে, কর্মক্ষেত্রে স্বমহিমায়।

(লেখিকা রাজনৈতিক নেত্রী এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী)



নারী শক্তিরূপিণী

দেবযানী ভট্টাচার্য

এই কাহিনির শুরু সেই অনেক কাল আগে সিনোজোয়িক যুগে, যখন পৃথিবীর বুকে প্রথম যাত্রা শুরু হলো মানুষ নামক স্তন্যপায়ী প্রাণীটির। নারী পুরুষ সবাই মিলে তখন শিকার করত, ফলমূল আহরণ করত আর বনে বনে ঘুরে বেড়াত। নারীরা কৌশলের দ্বারা বড়সড় বন্য জানোয়ারকে ভুলিয়ে ভালিয়ে দঙ্গলছুট করত আর পুরুষেরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই দঙ্গলছুট জানোয়ারকে বধ করে সকলের খাদ্যের ব্যবস্থা করত। এমনভাবেই একদিন নারীর হাত ধরেই মানুষ শিখেছিল কৃষিকার্যও। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে যে সময়টাতে মেয়েরা শিকার করতে যেত না, তেমনই কোনও একটা সময়ে কেউ জেনে ফেলেছিল যে, গাছের বীজ মাটিতে পড়লে তা থেকে বেরোয় নতুন গাছ। আমাদের এই সভ্যতা কৃষিকাজ শিখেছিল সেই আদিম নারীদের কিচেন গার্ডেন থেকেই।

ধীরে ধীরে মানুষ সভ্য হলো, সমাজ গঠন করল। সেই সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মেয়ে-পুরুষ সকলেই অন্ন সংস্থানের জন্য কাজ করত। উপরন্তু, মেয়েরা সন্তানের জন্ম দিত। ফলে তারাই হয়ে উঠেছিল সমাজের মাথা। বহু হাজার বছর ধরে চলেছিল এই ব্যবস্থা। এমনই কোনও এক সময় দুর্গা যুদ্ধ করেছিলেন মহিষাসুর নামক কোনও এক প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষের সঙ্গে। অন্য পুরুষেরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। মহিষাসুরের সঙ্গে দুর্গার এই লড়াই ছিল একটা 'পাওয়ার ব্যাটল'। এ থেকে এটা অন্তত স্পষ্ট যে আজকের নারীদের মতো শারীরিকভাবে দুর্বল দুর্গা ছিলেন না। তাঁর শারীরিক শক্তি ছিল সেদিনের যে কোনও শক্তিশালী পুরুষের তুল্যমূল্য। একথা বোধকরি একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য যে কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে আজও সত্যি। বাঘ আর বাঘিনীর শারীরিক শক্তিতে খুব তফাত আছে কি? যাই হোক, দুর্গার সেই যুদ্ধ ছিল মাতৃতান্ত্রিক যুগের ঘটনা।

এভাবে ক্ষমতা উপভোগ করতে করতে মেয়েরা ক্রমশ হয়ে উঠল অলস, আরামপ্রিয়। তারা ঘুরে ঘুরে খাদ্য আহরণের ক্লেশ স্বীকারে বিমুখ হয়ে গৃহজীবনের নিশ্চিন্ত আরামে নিজেদের আবদ্ধ করে ফেললো আর পুরুষকে পাঠালো খাদ্য আহরণে। যদিও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার উদ্দেশ্যে আহরিত খাদ্য বণ্টনের অধিকারি নারী রাখল নিজের হাতেই। এমনভাবেই চলেছিল আরও বহু হাজার বছর।

তারপর একদিন পুরুষ প্রতিবাদ করল। সমস্ত কষ্ট শুধু নিজেরা স্বীকার করে নারী এবং তাদের নাবালক সন্তানদের খাদ্যের জোগান দিতে অস্বীকার করল তারা। কিন্তু ততদিনে মেয়েরা হারিয়ে ফেলেছে তাদের শারীরিক সক্ষমতা। দুর্গা তখন বহু অতীত। ক্ষমতার মোহে নারী ততদিনে ভুলেই গিয়েছে যে ক্ষমতা আর দায়িত্ব একে অপরের পরিপূরক। তারা তখন আর পরিশ্রম করতে পারে না। কে জোগাবে খাদ্য? কে বাঁচাবে তাদের সন্তানকে?

তারপরেই এলো একটি বিশেষ পুরুষের দ্বারা একটি বিশেষ নারীকে অধিকার করার প্রশ্ন। চুক্তিটি সহজ। যে মেয়ে যে পুরুষের অধীনস্থ হবে, তার এবং তার সন্তানদের দায়িত্ব সেই পুরুষের। তখন পুরুষ সবল আর নারী হয়ে পড়েছিল দুর্বল। নারীর অলসতা পুরুষকে নিয়ে গিয়েছিল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। শুরু হয়ে গিয়েছিল পিতৃতন্ত্র।

তারপর কাটল আরও বহু সহস্রাব্দ। পুরুষতন্ত্র নারীকে ক্রমশ নিয়ে গেল তার 'মানুষ' সত্তা থেকে দূরে, করে তুলতে চাইল কেবল একজন 'নারী'। এমনই একটা সময়ে, যখন ভারতবর্ষে শুরু হয়নি ষোড়শ মহাজনপদের উত্থান, হস্তিনাপুর রাজসভায় বস্ত্রহরণ করা হলো কুলবধূ দ্রৌপদীর। তাঁর নারীত্ব তথা অস্তিত্বের অবমাননা করার উদ্দেশ্যে। তারপরেও কেটেছে আরও প্রায় ৩০০০ বছর। আজও হয়তো অবচেতনের গভীরে পুরুষ ভোলেনি, কোনো এক সুদূর অতীতে নারী দেখিয়েছিল ক্ষমতার দাপট। তাই সময় যত এগিয়েছে নারীকে ক্রমশ আরও কোণঠাসা করা হয়েছে। নারীর সবচেয়ে বড় শক্তি, সন্তান ধারণের শক্তিকে করে তোলা হয়েছে তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। কে তোমার সন্তানের পিতা? এই মোক্ষম প্রশ্নের ঘায়ে কাবু হলো নারী। এমনকী আজ সামান্য কিছুদিন হলো যখন ডি.এন.এ. পরীক্ষার মাধ্যমে তার সদুত্তর পাওয়া সম্ভব, তখনও তা রয়ে গেছে সাধারণ নারীর জ্ঞানসীমার বাইরে। আর এই হলো পুরুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, যে অস্ত্রে নারীর মনুষ্যত্বকে হত্যা করে কেবল নারীত্বকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। এইভাবে পুরুষ গ্রাস করতে চাইল নারীকে। প্রথমে আনুগত্য, শরীর, মন, পরে তার মনুষ্যত্ব, এমনকী বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত।

তাই ২০১২ সালে দিল্লিতে দামিনী যখন বললো যে সে মরতে চায় না তখন আবার মনে পড়ে গেল সেই সুদূর অতীতের কথা। যখন কোনো পুরুষ পারেননি, তখন পেরেছিলেন দুর্গা। যেদিন নারী হওয়ার অপরাধে দামিনীর কাছ থেকে পুরুষ ছিনিয়ে নিয়েছিল তার বাঁচার অধিকার, সেই একই দিনে বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ের ধারে এক কাগজ-কুড়ুনিকেও মরতে হয়েছিল পুরুষের লালসায়। সেও দামিনীর মতো বাঁচতে চেয়েছিল কি? আমরা জানি না। কারণ বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় পুরুষের দ্বারা আক্রান্ত মেয়ে নিজেই আর বাঁচতে চায় না। কারণ পুরুষ তাকে ভাবিয়েছে তার নারীত্ব তার মনুষ্যত্বের চেয়েও মূল্যবান। এবং পুরুষ প্রভাবিত অন্য অনেক নারীও, সমর্থনই করেন আক্রান্ত মেয়ের বাঁচতে না চাওয়াকেই। কখনো এমনও ভাবেন যে মেয়েটির পোশাক বোধহয় তার আক্রান্ত হওয়ার কারণ। আবার কখনো ভাবেন যে মেয়েটিই সম্ভবত প্রলুব্ধ করেছিল পুরুষকে। সে ভ্রষ্টা। বিগত বহু শতাব্দী ধরে পুরুষ মেয়েদের ভাবিয়েছে যে নারী জীবনের সাফল্য বোধহয় কেবল শারীরিকতার মধ্যেই নিহিত। ফলে সেই শরীর যদি আক্রান্ত হয় তবে নারী জীবনের মূল্য আর রইল কী? মৃত্যুপথযাত্রী দামিনী এর প্রতিবাদ করেছিল।

দামিনীর প্রতিবাদের মান রাখতে আমরা কি পারি না? কোনো মেয়ে আক্রান্ত হলে সঙ্ঘবদ্ধ মাতৃশক্তি কি পারে না তার পাশে দাঁড়াতে নীরব প্রতিবাদে? নারীকে শুধু উপলব্ধি করতে হবে যে তার শারীরিক নারীত্ব কোনো মহার্ঘ্য বস্তু নয়, কেবল তার প্রাণীবৈশিষ্ট্য মাত্র, কেবলই পঞ্চতত্ত্ব! জৈব রসায়নের ভাষায় কেবল কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন আর সালফার দিয়ে তৈরি এক নশ্বর পদার্থ। তাই শরীর আক্রান্ত হলেও সে হারায় না কিছুই, শুধু আঘাতপ্রাপ্ত হয়, এই মাত্র! সারমেয় দংশন হলেও তো আমরা ব্যথা পাই। সঙ্ঘবদ্ধ মাতৃশক্তি কী এই সারার্থ বোঝাতে পারেন না আক্রান্ত কন্যাকে? যে অমূল্য নারীত্ব সমাজগঠনের ভিত্তি, সেই নারীত্বের অস্তিত্ব নারীর শরীরে নয়; মনে, মস্তিষ্কে, মননে, চিন্তার সাবলীল স্বচ্ছতায়, কর্তব্যনিষ্ঠায়, মাতৃধর্মে, সমাজ ও সংসারের সুষ্ঠু পরিচালনায়। সঙ্ঘবদ্ধ মাতৃশক্তি আক্রান্ত কন্যাকে একথা বোঝাতে পারেন না? পারেন না তার শুশ্রূষা করতে? নারীধর্ষণ প্রতিরোধ করতে এইভাবে ঘোষণা করা যেতে পারে এক নৈতিক যুদ্ধ।

অহিংস হলেও এমন তীব্র প্রতিবাদের পথ মসৃণ তো হবে না নিশ্চয়। সে যুগের দুর্গা ছিলেন শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান। আজকের মাতৃশক্তি না হয় মনোবলেই শুরু করলেন প্রকৃত দেবী আরাধনা।

আবাল্য নিয়মিত শারীরিক শক্তির চর্চা করলে শিশুকন্যাদের শরীর, মন দুই-ই যেভাবে সুগঠিত হবে, তাতে আক্রান্ত হলেও তাদের থাকবে প্রতিরোধ ক্ষমতা। আজ থেকে দেশের সমস্ত শিশুকন্যাও যদি শারীরিক শক্তির চর্চা শুরু করে তাহলে মেয়েদের হৃত শারীরিক শক্তি পুনরুদ্ধারে হয়তো কেটে যাবে আরও প্রায় পাঁচ প্রজন্ম। তারপর এমন এক দিন আসবে যেদিন লিঙ্গদৌর্বল্যের কারণে আর নারী আক্রান্ত হবে না পুরুষের দ্বারা।

এবার আসি শেষ প্রশ্নে। উন্মত্ত সারমেয়কে আমরা তো মেরেই ফেলি! তাহলে ধর্ষক পুরুষেরও কি মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য? তা সে বিচারের ভার না হয় পুরুষের হাতেই রইল। ধর্ষক পুরুষ নিশ্চয় বোঝে না যে, সে ধর্ষণ করছে নারীকে নয়, পুরুষের ভাবমূর্তিকেই। তাই তার কী শাস্তি হওয়া উচিত সে সিদ্ধান্ত না হয় পুরুষই নিক। যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা! ▮



পুঞ্জীভূত মাতৃভাবময়ী দেবীদুর্গা

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

দুর্গাপুজো এসে গেল। শরতের আকাশে হালকা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। বর্ষার জলে ধুয়ে বাতাস স্নিগ্ধ নির্মল। শিউলিগাছে ফুল এসেছে। অপরাজিতা ফুটছে। পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেল বাঁধার কাজ অনেক এগিয়ে গেছে। কুমোরটুলিতে যেমন, তেমনই সারা বঙ্গ জুড়ে কুমোরপাড়াগুলিতে দেবী প্রতিমা তৈরির কাজও এখন শেষ পর্যায়ে চলছে। আপামর বাঙালি তো বটেই, বহু অবাঙ্গালিও অপেক্ষা করে আছে মহালয়ার প্রাক্কালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই অনবদ্য কণ্ঠে মাতৃ-আবাহনের চিরপরিচিত অনুষ্ঠানটির জন্য। ভোরের আলো ফোঁটার আগেই কখন সেই আবাহনের বাণী আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে ধ্বনিত হবে— তার জন্য। মহালয়ার প্রাক্কালের এই অনুষ্ঠানই তো শৈশবাবধি দেবী দুর্গার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে চলেছে।

একটা সময় ছিল যখন ভোরের রাগ-রাগিনীতে বাঁধা দেবী আবাহনের গানগুলিই মনকে বেশি টানত, সঙ্গে পাঠ করা স্তোত্র থাকত পিছনের সারিতে। এখন গানের সঙ্গে সেই স্তোত্র পাঠও সমানভাবে মনকে আকর্ষিত করে। সেই স্তোত্রের এক জায়গায় বলা হয় দেবীদুর্গা সর্বভূতে কী কী রূপে বিরাজিত রয়েছেন তার কথা। মাতৃশক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে সর্বভূতে মাতৃরূপে, শান্তিরূপে, দয়ারূপে, শ্রদ্ধারূপে, বুদ্ধি-তৃষ্ণা- নিদ্রারূপে, কান্তি-ক্ষান্তি ও আবর্ত বহুবিধ রূপে বিরাজ করছেন। তাঁকে প্রণাম জানাই। সর্বভূত অর্থে যদিও চেতনের সঙ্গে জড়ও অন্তর্গত থাকে, যদিও চর এবং অচর দুই সর্বভূতের অন্তর্গত হয়, তবু জড়ের মধ্যে চেতনার ক্ষীণ অভিব্যক্তিকে বোঝার ক্ষমতা আর ক'জনের থাকে! তাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষ চেতনের মধ্যেই দেবীর প্রকাশের অভিব্যক্তিকে বুঝতে চেষ্টা করি। এই চেতন জগতে সকল প্রাণী অর্থাৎ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম ইত্যাদি সকলের মধ্যে সেই দৈবী শক্তি নানারূপে প্রকাশিত। তাঁর সকল রূপের মধ্যে মাতৃরূপের তুলনা হয় না।

মাতা জন্মদাত্রী, পালয়িত্রী। মাতৃরূপে দেবীশক্তি সৃষ্টি ও স্থিতির দ্যোতক। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে ধরণীতে স্থিত করেন। সন্তানকে ক্ষুধায় আহার দান করেন, রোগ-পীড়ায় অতন্দ্র হয়ে সেবা করেন, বিপদে আগলে রেখে পথনির্দেশ দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করেন, সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্নেহ দিয়ে, শাসন দিয়ে তাকে সৎপথে চালিত করেন। সন্তান ক্ষতি করলেও ক্ষমা আসে মায়ের কাছ থেকেই। এই জননী, জনয়িত্রী যেমন মানব সমাজে রয়েছেন তেমনই রয়েছেন প্রাণী জগতেও সকলের মধ্যে। মানব সংসারের ক্ষুদ্র পরিসরে যে কাজটি মানবী মাতা করেন, সেই কাজই জগৎজোড়া প্রাণীর রাজ্যে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতারাও করে। সর্বত্র নিঃশব্দে নিজ নিজ প্রজাতিকে প্রতিযোগিতার জগতে টিকে থাকার উপযুক্ত করে তোলার কাজটি, প্রতিষ্ঠিত করার কাজটি করে চলেছে সেই মাতৃ সমাজ। জগৎ জোড়া এই মাতৃরূপের অনুভব যে কেউ একটু সন্ধানী দৃষ্টিপাত করলেই পাবেন। যেমন পাখি-মা নিজের বাসাটিতে পালক বিছিয়ে অণ্ড প্রসব করে। তারপর অশেষ ধৈর্যে নিজের শরীরের তাপ দিয়ে তাকে সেচন করে যতক্ষণ না তার থেকে শাবকটি বেরিয়ে আসে। তারপরই শুরু হয় আহারের ব্যবস্থা করা। সারা দিন অক্লান্ত হয়ে শাবকদের কী বিপুল পরিমাণে আহার করায় সেই মা, তাও আমরা দেখি। শাবক একটু বড়ো হলেই সেই মা তাকে বারবার বাসা থেকে ঠেলে বার করে দেয় যাতে সে উড়তে শেখে। উড়তে শিখে আরও একটু বড় হলেই মা আর তাকে নিজের বাসায় রাখে না। ঠেলে বার করে দিয়ে তাকে স্বাবলম্বী করে। বৃক্ষজগতেও নিজের প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বীজকে দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দিতে গাছ যে কত ধরনের প্রক্রিয়া করে তা পড়ে মুগ্ধ হতে হয়। ছোটো চারাটি যাতে বাঁচে তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজও বৃক্ষমাতাই করে। কাছের মাটিতে জন্মানো চারাটি যাতে শেকড় ছড়াতে পারে তাই বৃক্ষমাতা মাটির ওপরের স্তরে শেকড় ছড়ায় না। নিজের শেকড়কে মাটির গভীরে প্রেরণ করে, চারাটির জন্য পুষ্টির জোগান সুনিশ্চিত করে।

রাজ্য হারিয়ে প্রজাদের কল্যাণ-চিন্তায় ব্যথিত রাজা সুরথ এবং স্ত্রী-পুত্রের অবহেলায় পীড়িত সমাধি বৈশ্য মেধামুনির আশ্রমে গিয়ে নিজ নিজ দুঃখের বিষয় নিবেদন করে তার থেকে মুক্তির উপায় জানতে চাইলে সেই ব্রহ্মবিদ্ ঋষি বলেছিলেন, জগতের সবার মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন মহামায়া জগন্মাতা। তিনি বিদ্যারূপিণী, আবার অবিদ্যারূপিণীও। সর্বভূতে তিনি প্রকৃতিরূপে বিরাজিতা। সকল প্রাণীর মধ্যেই নানা রূপে তাঁর প্রকাশ। জীবের মধ্যে মাতৃরূপে, ক্ষুধা, নিদ্রা, বুদ্ধি, দয়া, শ্রদ্ধা, শান্তি, শক্তি ইত্যাদি নানাভাবে তিনিই বিরাজ করছেন। তাঁর আরাধনা করলেই সর্ব মনোরথ পূর্ণ হবে।

আমরা সাধারণ মানুষ তাঁর নানারূপে বিরাজিত হওয়ার তত্ত্ব তেমন না বুঝলেও তাঁর সর্বভূতে মাতৃরূপের প্রকাশকে অবশ্যই বুঝি। সেই মাতৃরূপিণী জগন্মাতাকে প্রণাম জানাই। নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। তাঁকে শত শত প্রণাম।

■



পশ্চিমের চাপে ভারতীয় পোশাক বিপন্ন নয় : অগ্নিমিত্রা পল

□ এবার পুজোয় মেয়েদের ফ্যাশনে কী বিশেষত্ব আপনার চোখে পড়ছে?

অগ্নিমিত্রা : হ্যান্ডলুমের পোশাক এবার খুবই ট্রেন্ডি। হ্যান্ডলুমের কাপড়ে তৈরি কুর্তি চুড়িদার গাউন সবই এবার পুজোয় চোখে পড়বে।

□ কোনও বিশেষ রং?

অগ্নিমিত্রা : ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশনের কথা যদি বলেন তা হলে এবারে সবচেয়ে ট্রেন্ডি কালার হলো রেড অ্যান্ড পিঙ্ক। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজোতেও তার একটা প্রভাব পড়বে। তবে অন্য রং যেমন সবুজ নীল কমলা—এসবও দেখা যাবে।

□ ট্রেন্ডি এবং ট্র্যাডিশনাল পোশাক নিয়ে এখনকার মেয়েদের মনে একটা দ্বন্দ্ব দেখা যায়। ব্যক্তিগতভাবে এবং পেশাদার হিসেবে আপনি কোন ধরনের পোশাক পছন্দ করেন?



অগ্নিমিত্রা : দুটোই। তবে কী পরব সেটা নির্ভর করে আমি কোথায় যাচ্ছি তার ওপর। যদি বিয়েবাড়িতে বা কোনও গানবাজনার অনুষ্ঠানে যাই তাহলে আমি ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরব। আরও একটা বিষয়ের ওপর আমার পোশাক নির্বাচন নির্ভর করে। সেটা হলো আমার ব্যক্তিত্ব। যে ধরনের পোশাকে আমাকে মানাবে আমি সেটাই পরব। আপনি ট্রেন্ডি পোশাকের কথা বললেন, এখন ট্রেন্ডি বলতে অনেক কিছু বোঝায়। হাফ প্যান্টও ট্রেন্ডি। তাই বলে আমি নিশ্চয়ই হাফ প্যান্ট পরব না। কারণ আমাকে মানাবে না।

□ মফস্সল এবং শহরের মেয়েদের ফ্যাশনে কি কোনও পার্থক্য আছে?

অগ্নিমিত্রা : না, নেই। মেয়েরা কী পরবে তার অনেকটাই নির্ভর করে মেয়েটির ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক মূল্যবোধের ওপর। শিক্ষাদীক্ষার ওপর। শহরের একটি মেয়ে যেমন





পোশাকের ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী হতে পারে, একটি গ্রামের মেয়ে আবার ততটাই আধুনিক হতে পারে। কে কোথায় থাকে তার ওপর পোশাকের রুচি নির্ভর করে না।

□ আর গ্রামে?

অগ্নিমিত্রা : একই ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, গ্রামের মেয়েদের ওপর সিনেমার একটা প্রভাব আছে। অনেক সময় হিট সিনেমার নায়িকার পোশাকও হিট হয়ে যায়। কিন্তু এবার কোনও সিনেমাই সেরকম হিট করেনি। তাই সিনেমার খুব একটা প্রভাব এবার থাকবে না।

□ অনেকেই বলেন বাঙালি মেয়েদের শাড়িতেই ভালো মানায়। আজকের প্রজন্ম শাড়ির ব্যাপারে কতটা উৎসাহী?

অগ্নিমিত্রা : একটা সময় ছিল যখন শাড়ি পরার চল কিছুটা হলেও কমে গিয়েছিল। আজকের প্রজন্ম আবার তা ফিরিয়ে এনেছে। ওরা যেমন ওয়েস্টার্ন আউটফিটে স্বচ্ছন্দ ঠিক তেমনি লেহেঙ্গা কুর্তি- চুড়িদার এবং শাড়িও ওদের পছন্দের। বিভিন্ন স্টাইলের মধ্যে ওরা বেশ ব্যালান্স করে চলতে পারে।

□ পশ্চিমি পোশাকের চাপে ভারতীয় পোশাক কি একটু বিপন্ন?

অগ্নিমিত্রা : একেবারেই নয়। এখনকার প্রজন্ম বৈচিত্র্যকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারে। তাই ভারতীয় এবং পশ্চিমি পোশাকের মধ্যে এখন কোনও দ্বন্দ্ব নেই। দুটোই আছে এবং থাকবেও।

(অগ্নিমিত্রা পল বিশিষ্ট ফ্যাশন ডিজাইনার)



দু'শো আটান্ন বছরের অভয়া দুর্গা

সপ্তর্ষি ঘোষ

শরৎকালের সঙ্গে 'শারদীয়া' শব্দটা যেমন অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে আছে, তেমন শারদীয়ার সঙ্গে দুর্গোৎসব শব্দটাও একেবারে একাত্ম হয়ে গেছে। তার কারণ বাঙ্গালি জীবনে এটি শুধুমাত্র একটি দেবী পূজা নয়, একটা মহোৎসবও বটে। সেই সুদূর অতীত থেকে আজও বাঙ্গালি ধনী-দরিদ্র, আবাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সারা বছর সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে দুর্গোৎসবের চারটি দিনের জন্য। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের এক মহান ঐতিহ্য, যা একান্তই বাঙ্গালির নিজস্ব। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, মাঠে-ঘাটে কাশ ফুলের সমারোহ, শিউলির সৌরভ— এই ত্রয়ীর সমন্বয় হলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে বাঙ্গালির মন। আবার তারই সঙ্গে বেজে ওঠে আগমনির সুর। এই সুর আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীতে আনন্দময়ীর আগমন বার্তা ঘোষণা করে। শহরের দুর্গাপূজা বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সর্বজনীন পুজো মণ্ডপের বৈচিত্র্যময় সাজসজ্জা। কলকাতা শহরকে এই ক'টা দিন একেবারে বদলে দেয় সর্বজনীন পুজোর জৌলুস। সর্বজনীন পুজোর জৌলুসের দাপটে প্রাচীন পারিবারিক পুজোগুলি ক্রমশ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাচ্ছে। অতীতের সেই আড়ম্বর, জাঁকজমকের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। এখন সবই গল্পকথা বলে মনে হয়। যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। ফলে দীনতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে পুজোর মধ্যে। বর্তমান প্রজন্মও ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপারে তেমন আন্তরিক নয়। তবু কলকাতার বেশ কিছু প্রাচীন ও বনেদি পরিবার আছে, যারা এখনও সেই সাবেকি ঐতিহ্য ও প্রথাকে বজায় রেখে প্রতি বছর দুর্গা পুজোর আয়োজন করেন। এসব পরিবারে পুজোর বৈশিষ্টগুলো যেমন বিভিন্ন রকমের, প্রতিমার রূপ ও সজ্জাও তেমন বৈচিত্র্যময়। আর এসব বৈশিষ্ট্যের পিছনে আছে কিছু কিংবদন্তি। উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়া অঞ্চলে 'দাঁ' পরিবারের 'অভয়া দুর্গা মাতা'-র পুজো এরকমই একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গোৎসব।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়ার জয় মিত্র স্ট্রিটে দাঁ বাড়িতে অভয়া দুর্গামাতার পুজোর সূচনা করেন রামনারায়ণ দাঁ। এই পুজোর শুরুর নেপথ্যে এক বেদনাদায়ক কাহিনি বিদ্যমান। রামনারায়ণ তার একমাত্র কন্যা দুর্গারানিকে অতি অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বিয়ের পর প্রথম মাঙ্গলিক কাজের জন্য বাপের বাড়ি এসে কলেরায় মারা যান দুর্গারানি। কন্যার অকাল বিয়োগে মা শোকে উন্মাদের মতো হয়ে পড়েন। তখন শোকার্ত পত্নীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য রামনারায়ণ দুর্গার অভয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পুজো শুরু করেন।

মৃন্ময়ী দেবীমূর্তির মধ্যে তিনি তার সদ্যোমৃতা আত্মজাকে খুঁজে পেলেন। তদবধি রথযাত্রায় প্রতিমার কাঠামো পুজো থেকে দুর্গাপুজোর মধ্যবর্তী সময়কালে দাঁ পরিবারে কন্যাদের বিবাহ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং 'ধূলিপায়ের দিন' নামে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। দেবী দুর্গাকে রামনারায়ণ মাতৃরূপে আরাধনা করেননি। সেই কারণে এদের দুর্গাপ্রতিমা সিংহবাহিনী, মহিষাসুরমর্দিনী, দশভুজা, রণচণ্ডিকা নন। মাতৃমূর্তির বদলে দ্বিভুজা কন্যামূর্তি। একচালার মূর্তি। দেবী ত্রিনয়নী, প্রসন্ন বদনা, সৌম্যা, শান্ত সমাহিত পরনে হলুদ শাড়ি। ডান পায়ের উপর বাঁ পা রেখে বসে আছেন। ডান পদতলে রয়েছে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। দুই পায়ে নূপুর। নাকে নোলক। এক হাতে অভয়, অন্য হাতে বরদান। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক আর গণেশের সাজগোজ বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েদের মতন। লাল ফিতে দিয়ে সরস্বতীর ও সবুজ ফিতে দিয়ে লক্ষ্মীর চুল ফুল করে বাঁধা। গণেশের হস্তীমুণ্ডের টাকের দুই পাশে চুল এবং কার্তিকের ঘাড় পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল।

সনাতনী রীতিনীতি ও নিষ্ঠায় অভয়া দুর্গামাতার পুজো আজও অব্যাহত। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে দেবী অভয়া চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্লাইভ থেকে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকেই এদের প্রতিমা দর্শনের জন্য এসেছেন। শাস্ত্র বিরোধী হলেও আজও পুজোর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রামনারায়ণ দাঁ-র নামেই পুজোর সংকল্প হয়। আগে এদের পুজোয় পাঁঠা বলি হতো। একবার বিঘ্ন ঘটায় বলি বন্ধ হয়ে যায়। এ নিয়ে একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা জানা যায়। একবার বলির সময় দুই কোপেও পাঁঠাটি না কাটায় পুরোহিত তৎক্ষণাৎ বলি বন্ধ করে পাঁঠাটিকে ছেড়ে দিতে বলেন। এরপর পাঁঠাটিকে সুস্থ করে তোলা হয়। এরপরও দশ বছর পাঁঠাটি বেঁচে ছিল। রাস্তায় বেরোলে বহুলোক পাঁঠাটিকে দেখে নমস্কার করত। এই ঘটনার পরই দাঁ-পরিবারে বলি বন্ধ হয়ে যায়। দাঁ-পরিবারের পুজোর আরএকটি বিশেষত্ব হলো, বিজয়া দশমীতে দেবীর বরণে অংশ গ্রহণ করেন পুরোহিত।

মেয়ের বাপের বাড়িতে আসার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই দাঁ বাড়ির 'অভয়া দুর্গা' পুজোয়। এই ক'টা দিন এরাও ভুলতে চান সেই কন্যাশোক, যা স্মৃতির সরণি বেয়ে পৌঁছে দেয় সুদূর অতীতে, যে সময়ে রামনারায়ণ দাঁ হারিয়ে ছিলেন তাঁর একমাত্র সদ্য বিবাহিতা কন্যা দুর্গারানিকে। আর এই স্মৃতিচারণই এই পুজোর প্রধান উপচার। ■



পটুয়াটোলার বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গোৎসব

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজোর কিছু খোঁজ তল্লাশ করতে গিয়ে হঠাৎই মনে পড়ে গেল পটুয়াটোলা লেনের আমার শ্বশুরালয়ের পুজোর কথা। এই সেই রাস্তা যেখানে সত্যজিৎ তাঁর 'অপরাজিত' ছবির অপুকে আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রথম হাজির করেছিলেন। এই বাড়ির ঐতিহাসিক অনুষঙ্গের সঙ্গে যোগ হয়ে গেল ২২৭ বছরের একাদিক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়া দুর্গোৎসবের বিরল গৌরব।

হুগলীর রাধানগর থেকে আরও ১২ বছর পর কলকাতায় প্রথম পৌঁছলেও নবগ্রামের রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৮৫ সালেই পাকাপাকিভাবে কলকাতায় এসে বসতি স্থাপন করেন, ৫৪ নম্বর পটুয়াটোলা লেনে (বাসিন্দাদের কাছে জানা গেল এই বাড়িতেই সত্যজিৎ শুটিং করেছিলেন)।

আজ গৃহস্বামীর ২২৭ বছর আগের জীবিকা সংক্রান্ত তথ্য লভ্য নয়। তবে সেই সময় উঠতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়ে তাদের রাজকর্মচারীদের 'নেটিভ' ভাষায় (সংস্কৃত) সড়োগড়ো করার প্রশিক্ষণ দিত। অনুমিত হয় রামহরিও হয়তো তাতে যোগ দিয়েছিলেন। রোজগারপাতি উপযুক্ত না থাকলে দুর্গোৎসব করা সহজ নয়।

১৭৮৫ থেকে ৬ বছর যাওয়ার পর ১৭৯১ সালে রামহরি ওই বাড়িতেই খড়ের চালার চণ্ডীমণ্ডপ তৈরি করে দুর্গোৎসবের শুরু করেন। অবিচ্ছিন্নভাবে যা আজও চলে আসছে। তবে এর মধ্যে ঠিকানা বদল হয়েছে। রামহরির পৌত্র উমেশচন্দ্র অনতিদূরে ৯/২ ঠিকানায় পুজো স্থানান্তরিত করেন। সুন্দর তিন খিলানের ঠাকুরদালান তৈরি হয়। ছোটোবেলা থেকে দেখেছি ওই ঠাকুরদালানেই ঠাকুর তৈরি হতো। তবে বিগত ৩০ বছর কুমোরটুলিতেই প্রতিমা নির্মিত হচ্ছে। একই শিল্পী পরিবার ৫০ বছর এ কাজে নিযুক্ত। তবে, দেবীপক্ষের সঙ্গে সঙ্গেই মহালয়ার দিন পটুয়ারা প্রতিমা বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। ষষ্ঠীর সকালে এসে তারা দেবীর রূপসজ্জায় শেষ টান দেয়।

মহালয়ার পরদিনই যথানিয়মে প্রতিপদাদি কল্পে বোধন হয়। স্থানাভাবজনিত কারণে আগেকার সেই অপরিসর বোধন ঘরটি কোনো বাধা হয় না। ঘর্মাক্ত কলেবরে তাঁরা দেবীর কাজ করে যান। ইতিমধ্যে প্রতিপদ থেকেই শুরু হয় পুজো, চণ্ডীপাঠ, আরতি। নিয়মমাফিক ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় দেবীমূর্তির সম্মুখে ঘট-স্থাপনা হয়।

না, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নয়। সপ্তমীর সকালে বাড়ির উঠোনেই হয় নবপত্রিকা স্নান। এ বাড়ির পুজো হয় কালিকা পুরাণ মতে। যে কারণে গত বছরও সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপুজো ও নবমীর দিন ছাগবলি হয়েছে। পরিবর্তিত সময়ের দাবি মেনে হয়তো এ বছর থেকে তা বন্ধ হয়ে যাবে। উৎসর্গীকৃত এই ছাগশিশু দেবীর কাছে নিবেদনের পর তা মহাপ্রসাদ হয়ে যায়। রন্ধনীকৃত সেই প্রসাদ রসনায় যে কী বিস্ফোরণের ক্ষমতা রাখত তা বলে বোঝানো যায় না। যারা কালীঘাটের পালা পার্বণের প্রসাদ সংগ্রহ করেন তারা আন্দাজ করতে পারবেন।

অবশ্য পুজোর ক'দিনই নিয়ম মেনে দেবীকে অন্ন, মাছ, পঞ্চ ব্যঞ্জন, ভাজা, পোলাও, খিচুড়ি, পরমান্ন সবই নিবেদিত হয়। প্রথা মেনে সময়ের অগ্রসরতার সঙ্গে প্রজন্ম বদল হয়। এখন এই পুজো সপ্তম প্রজন্মের হাতে। পুজোর সঙ্কল্প হয় প্রবীণ সদস্যের নামে। এই সময়ই উচ্চারিত হয় বিগত দিনের সব পূর্বপুরুষদের নাম। এবারে দেবীরূপ সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া দরকার। সনাতনী রূপকল্পে এক চালার ডাকের সাজের প্রতিমা। দেবী দুর্গা কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও আনুষঙ্গিক বাহন সমেত বিরাজমান। দেবীর মুখশ্রীতে এক অনাদিকালের দৃপ্ত ছায়া। এই সনাতনী মুখাবয়ব চিরকাল ভক্তের মনে, দুঃখীর মনে শক্তি জুগিয়েছে। দিয়েছে বাঁচার

প্রেরণা। তাই তো এত পূজা উপাচার, এত শুদ্ধতা। এখানে দেবী দুর্গার বাহন সিংহের রঙটি সাদা। আবার অসুরের গায়ের রঙ সবুজ। এসবের পৌরাণিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে।

মধ্য কলকাতার অতীতে 'বিদ্যাসাগর' বিধানসভা নামে অভিহিত এই অঞ্চল বৃহত্তর অর্থে পটলডাঙা হিসেবে খ্যাত। কৃষ্টি সংস্কৃতির পীঠস্থান। পুজোবাড়ির এপাশে ওপাশে দু'দিকেই পুজোকর্তাদের বসতবাড়ি। সবই শতবর্ষ উত্তীর্ণ। পুজো উপলক্ষ্যে কোনো একটি বাড়িতে বসে যেত ঘরোয়া গানের আসর। রেকর্ডের যান্ত্রিকতার বাইরে গিয়ে কোনো এক পুজোয় বেরোন মানবেন্দ্রর 'বারে বারে কে যেন ডাকে, কার ছোঁয়া লাগে যেন মনোবীণা তারে' গানটি পুজো বাড়ির আনন্দঘন পরিবেশে মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল। আজও ভুলতে পারিনি।

ভুলতে পারিনি পুজো চলাকালীন মেসোমশায়ের মুখে ঘিরে থাকা চাপা উদ্বেগের ছবি। সদাই ভাবতেন পুজোয় কোনো ত্রুটি না হয়ে যায়! আবার সন্ধিপুজো মিটলেই নেমে আসত প্রশান্তি। তখন কারুরই ভুরিভোজ না খেয়ে পার পাওয়ার উপায় ছিল না। এই খাওয়ার প্রসঙ্গে ভেসে এল অতীত ইতিহাস। এ বাড়ির পুজোর ১০৩ বছর আগেকার একটি পুজোর আমন্ত্রণ লিপি রয়েছে। রয়েছে ৮০ বছর পূর্বের দেবী দর্শনের আমন্ত্রণ লিপিতে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ। এই নিমন্ত্রণপত্র গোটা পাড়ায় বিলি করা হতো। শোনা যায় পুজোর কদিন পল্লীর বাড়িগুলিতে রন্ধনের পাট থাকত না। সকলেরই

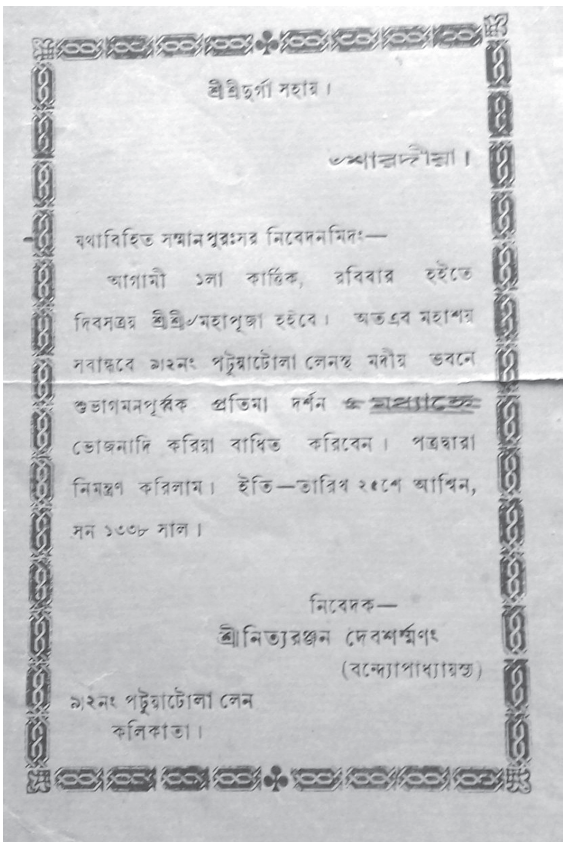

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

সাদরনিবেদনমিদং—

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

আগামী ১লা কার্ত্তিক, রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীশ্রী৺মহাপূজা হইবে। অতএব মহাশয় সবান্ধবে ৯২নং পটুয়াটোলা লেনস্থ নবীয় ভবনে শুভাগমনপূর্ব্বক প্রতিমা দর্শন ও মধ্যাহ্নে ভোজনাদি করিয়া বাধিত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি—তারিখ ২৫শে আশ্বিন, সন ১৩৩৮ সাল।

নিবেদক—
শ্রীনিত্যরঞ্জন দেবশর্ম্মণঃ
(বন্দ্যোপাধ্যায়স্য)

৯২নং পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা।



গন্তব্য ব্যানার্জি বাড়ি। দর্শনার্থীর ভিড় অতীত ঐতিহ্যের প্রতিই আকর্ষণ। এই সব পূজা অনুষঙ্গের কথা বলতে বলতেই শুনলাম পাড়া ছেড়ে যাঁরা দীর্ঘকাল চলে গেছেন তাঁরাও প্রতিমা দর্শনে আসেনই।

আরও একটা জিনিস বরাবরই মনে হয়েছে। পাশেই মহা ধুমধামের কলেজ স্কোয়ার বা মহম্মদ আলি পার্কের তীব্র রোশনাই থেকে ছিটকে এসে মানুষ যেন সাবেকিয়ানার পরিবেশে কিছুটা হারানো স্নিগ্ধতা বা দেবীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পান। পাশেই ৮নং বাড়িতে হয় এই পরিবারের এক সদস্য ভারতের প্রথম অ্যাটর্নি বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজো।

এবারও পুজো যথা নিয়মে এগিয়ে আসছে। নীরবে এগিয়ে চলেছে প্রস্তুতিও। অনেকেই পরম্পরা ঐতিহ্যের নানা ব্যাখ্যা দেন। ৯/২ পটুয়াটোলা লেনে তার চাক্ষুষ উদাহরণ পাওয়া যাবে। আজকালকার চালু হওয়া পুজোর দালানে দেহসৌষ্ঠব বা অলঙ্কার প্রদর্শনী এখানে কোনোদিনই দেখা যায় না। কিন্তু যা বরাবর দেখা যায় তা হলো নিজেকে নিবেদনের নিষ্ঠায় কোনো ত্রুটি না রাখা। এই সুপ্রাচীন পরিবারের কী পুরুষ কী নারী কী কিশোর কী কিশোরী তাদের মধ্যে যে মহার্ঘ পরম্পরা প্রবহমান তাকে ধরে রাখতে তারা অবিচল। ■



দেশে দেশে মা দুর্গা

দিলীপ পাল

পুরাণে আছে, দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন তিনবার। তিন রকম রূপ ধারণ করে। প্রথমবার উগ্রচণ্ডা রূপে, দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার ভদ্রকালী এবং দুর্গারূপে। দেবী উগ্রচণ্ডার হাতে হত হবার পর মহিষাসুর আবার নাকি প্রকাশিত হয়। এই সময়ে একদিন মহিষাসুর স্বপ্নে দেখেন ভগবতী ষোড়শভুজা ভদ্রকালীর রূপ ধারণ করে তার শিরশ্ছেদ করতে আসছেন। এর পরই মহিষাসুর দেবীর আরাধনা শুরু করলেন। অসুরের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী আবির্ভূতা হলে অসুর দেবীকে বলেন, আমি সর্বযজ্ঞে আপনার সঙ্গে পূজিত হতে চাই। তাঁর প্রার্থনা শুনে দেবী বললেন, উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী এবং দুর্গা— এই তিন মূর্তিতেই তুমি আমার পদলগ্ন হয়ে থাকবে এবং যেখানে আমার পুজো হবে, সেখানে তুমিও পুজিত হবে। সেই থেকেই দুর্গাপুজো হলে তাঁর মূর্তিটি হয় মহিষাসুরমর্দিনীর। আর তাঁর সঙ্গে পুজো হয় মহিষাসুরেরও। এই কাহিনিটি পুরোপুরি ভারতীয়ই। কারণ মহিষাসুরের সঙ্গে দুর্গার লড়াই হয়েছিল বিন্ধ্য পর্বতে। কিন্তু বর্তমান তুরস্কের পাগমিন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি বিশাল বেদীর ধ্বংসাবশেষ। এই বেদীর গায়ে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যমালার বিষয়বস্তুতে দেখা যাচ্ছে দেবতা ও অসুরের মধ্যে যুদ্ধ। ঐতিহাসিকরা মনে করেন আবিষ্কৃত এই বেদীটি খ্রিস্ট জন্মের আগেকার তৈরি। প্রাচীন এই ভাস্কর্যটি রয়েছে এখন বার্লিনের একটি মিউজিয়ামে। ইতিহাস বলে, প্রাচীন গ্রিসের মানুষেরা 'অ্যাথিনা'কে মানতেন গ্রিসের রণদেবী হিসাবে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন সবরকম শুভ-অশুভ থেকে অ্যাথিনাই তাঁদের রক্ষা করেন। দেবতা ও অসুরের সঙ্গে একবার যুদ্ধ বাধলে অ্যাথিনা তাতে অংশগ্রহণ করে অসুরদের বিনাশ করেছিলেন। আর তাঁর এই যুদ্ধ জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে প্রাচীন গ্রিসে কিছুকাল অন্তর অন্তর পালিত হতো এক উৎসব। নাম-'প্যান অ্যাথিনিয়া'।

ঐতিহাসিকরা বলেন, পাগমিনে পাওয়া বেদীর গায়ে উৎকীর্ণ ওই মূর্তিটি 'দেবী-অ্যাথিনা'রই মূর্তি। মূর্তিটি দেখা যায়— দেবী অ্যাথিনা একটা অসুরকে বর্শা দিয়ে আঘাত করছেন। আর তাঁর সঙ্গী একটি সিংহ কামড়ে হিঁচড়ে কুপোকাত করেছে অসুরটাকে। দেবী অ্যাথিনা'র সঙ্গে আমাদের অসুরদলনী দুর্গার সাদৃশ্যটা যেন আশ্চর্য্যরকমের। পণ্ডিতদের মতে আমাদের 'দুর্গা'র নামকরণে জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর চরিত্রে রণনিপুণতার বিকাশ থাকলেও অসুরনিধনের খ্যাতি এবং সিংহবাহনা পরিচিতির তারিখ কিছুতেই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের আগে নয়। সেইদিক থেকে গ্রিকদেবী অ্যাথিনা ছাড়াও বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মাতৃরূপী দেবতার ধারণায় অসুরদলনী চিন্তার ছাপ এবং তাঁদের বাহন হিসাবে সিংহের উপস্থিতি সম্ভবত স্পষ্টই দেখা যায় আগে থেকে। তাহলে সিংহবাহিনী দুর্গা কি এদেশে বহিরাগত?

বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে একসময় আমাদের দেবী দুর্গারই মতো দেবী পুজো বা মাতৃপুজোর প্রচলন ছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এইসব দেবীরা হলেন— গ্রিসেরই আরো দেবী 'রিয়া', ব্যাবিলনীয় 'ননা', মিশরের দেবী 'ইস্থার', এশিয়া মাইনরের দেবী 'সিবিলি', জাপানের 'চনর্কি', চীনের 'ক্যান্টন' শহরের বৌদ্ধ মন্দিরের 'শতভুজাদেবী', ভূমধ্যসাগরের ক্রিটদ্বীপের 'সিংহবাহিনী দেবী'ও এই পর্যায়ে পড়েন। আমাদের পুরাণগুলিতেও দেশান্তরে অনুরূপ দেবীর অস্তিত্বের কথা লিপিবদ্ধ আছে। এইসব দেবীর আকৃতি যেমন আমাদের দুর্গার মতো, ঠিক তেমনই এঁদের মধ্যে ভারতীয় মাতৃপূজার প্রভাবও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ এঁরাও যেন আমাদের মহামায়া দুর্গারই প্রতিরূপ— 'বিদেশিনী দুর্গা'।

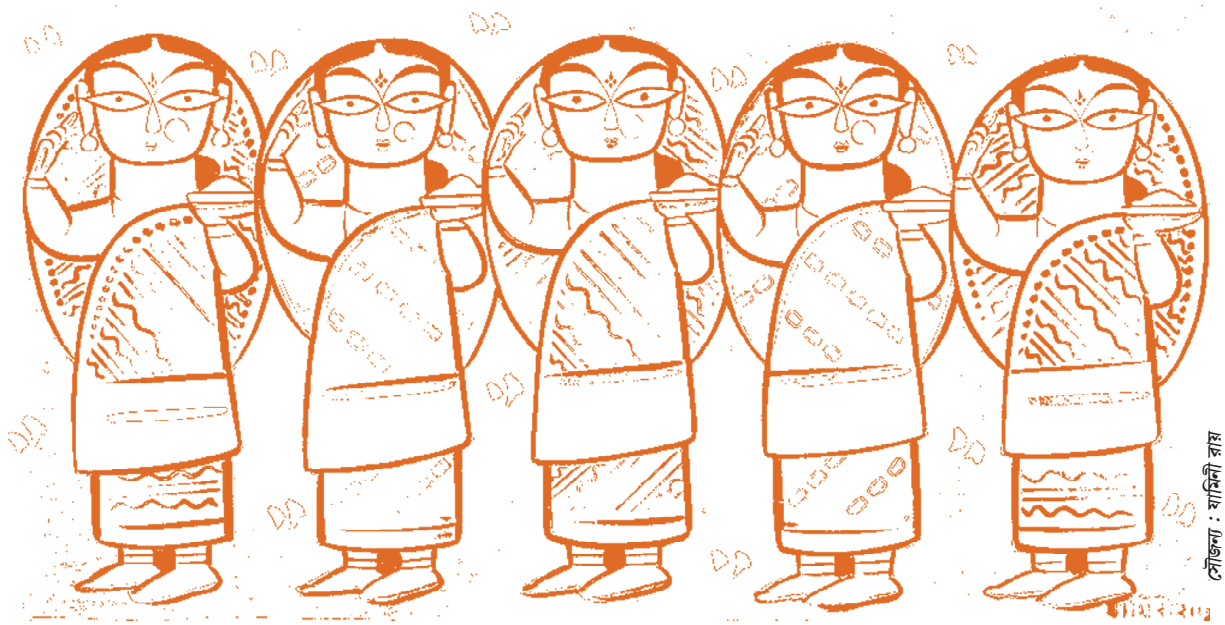

সৌজন্য : যামিনী রায়

বড়দের রূপকথা

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

রূপকথায় রক্তারক্তি। আগে কখনও শোনোনি বুঝি? প্রেম-বিয়ে- ভালোবাসাবাসি, সেসব যখন হয়ে থাকে, তখন বিদ্বেষ-ঘৃণা- প্রতিশোধ, ওসবও যা যা ঘটে এই জীবনে, রূপকথাতেও তা কেন ঘটবে না? সংক্ষেপে গল্পটা যদি বলতে শুরু করি, তবে মাঝখানে তোমরা হয়তো কেউ কেউ বলে উঠবে, ওহ্ জানি জানি, ঠিক এমনটাই হবে, জানতাম...

কী হবে না হবে সেসব না ভেবে বরং গল্পটাই বলি। রাজামশাই ছিলেন বেজায় কৃপণ। তবে হ্যাঁ, একমাত্র কন্যাটিকে ভালোবাসতেন খুব। সেখানে কৃপণতা ছিল না কোনও। কিন্তু, পাছে কোনও ছেলেছোকরাকে ভালোবেসে পালিয়ে যায় কিংবা বিয়ে দিতে হয় অনেক খরচাপাতি করে— এই ভাবনায় সদা ম্রিয়মাণ। ভালোবাসা- ভাগাভাগি কিংবা বিয়ে। সবই খরচের ব্যাপার। কাজেই রাজকন্যের ঠাঁই হলো প্রাসাদের এক কোণে, চিলেকোঠার ঘরে।

রাজধানীতে একদিন বেড়াতে এল এক খুনে-ডাকাত। উঠল প্রাসাদের কাছেই এক দামি সরাইখানায়। অনেক রোজগার-টোজগার করে এনেছে, কিছুদিন স্ফুর্তিতে আমোদে আহ্লাদে কাটানোর বাসনা তার। কাজেই, প্রাসাদের চিলেকোঠার দিকে নজর তো পড়বেই, সন্ধ্যে থেকে গোটা রাত্তিরই সেখানে রঙিন আলো জ্বলে যে! লোকজনকে শুধিয়ে সে জেনে নিল, সেখানে কৃপণ রাজার একমাত্র কন্যাটি থাকে। ব্যস, এরপর আর অমন করিৎকর্মা খুনে-ডাকাত আর স্ফুর্তিবাজ লোককে রোখে, সাধ্য কার? রক্ষীদের নজর এড়িয়ে, যথাসময়ে সে দেওয়াল বেয়ে গাছের ডালপালা টপকে চিলেকোঠার জানলায় গিয়ে হাজির। জানলায় হঠাৎ অচেনা পুরুষমানুষের মুখ দেখে তো রাজকন্যে বেচারির আক্কেল গুড়ুম! বাঁচাও, বাঁচাও। ডাকাত-বাবাজি ততক্ষণে ছাদ-টাদ টপকে পগার পার! চারদিক দেখেশুনে রক্ষীরা বোঝাল, ও কিছু না ম্যাডাম। আপনি হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, নিশ্চয় স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছেন। চিলেকোঠার জানালায় আবার লোক-টোক আসবে কোত্থেকে?

পরদিন সকালে বাবাকে ব্যাপারটা বলতে তিনিও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। যত্তোসব আজেবাজে কথা! ওই চিলেকোঠায় গিয়ে উঠবে, এই রাজ্যে অত সাহস কার? কিন্তু, কী কাণ্ড, পরদিনও ঠিক সেই একই ব্যাপার। সেই একই সময়ে ডাকাত এসে ফের জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। রাজকন্যে ফের চিৎকার করল, ডাকাত, ডাকাত, বাঁচাও...এবং

যথারীতি আজও কেউই বিশ্বাস করল না।

তৃতীয় রাত্তিরেও অমন হতে পারে জেনে রাজকন্যে সজাগ রইল। হাতে রাখল একটা ছোরা। তারপর, যেই না মনে হলো কেউ যেন জানলা খোলার চেষ্টা করছে, অমনি লাফ দিয়ে উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল সে। তক্কে তক্কে ছিল, জানলা দিয়ে একটা হাত ঢুকে আসছে দেখেই, শক্ত হাতে ছোরা বাগিয়ে সে দিল সেই হাতে এক কোপ। ব্যস। বাপরে-মারে করে পালিয়ে যেতে যেতেও ডাকাত কিন্তু বলে গেল, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা! এর ফল ভুগতে হবেই...

পরের দিন, রাজামশাই আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের সেই কাটা হাত দেখাতেই সকলের চক্ষু ছানাবড়া! রাজকন্যের সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করে সবাই শেষমেশ ব্যাপারটা বিশ্বস করতে বাধ্য হলো। সেই রাত্তিরের পর থেকে রাজকন্যের থাকার ব্যবস্থাও গেল পাল্টে, স্থান হলো অন্দরমহলের সুরম্য সুরক্ষা বলয়ে।

দিন যায়, মাস যায়। একদিন ভিনদেশি এক বণিক এলেন রাজামশায়ের সঙ্গে আলাপ করতে। কথাবার্তায় চৌকস, পরনে দামি পোশাক, শুধু হাত দু-খানি দস্তানায় ঢাকা। দেশে দেশে নানান কাজে তিনি ঘুরে বেড়ান, বিয়ে করার সুযোগ হয়নি এখনও। তবে এইবার তাঁর সময় সুযোগ অনুকূল। সুতরাং যথার্থ সুন্দরী ও সদ্‌বংশজাত একটি মেয়েকে বিয়ে করে তিনি থিতু হতে চান— রাজাকে জানালেন তিনি। ধনী মানুষ, কাজেই সমস্ত ব্যয়ভার দায়ভার তাঁর। যোগ্য পাত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনায় রাজামশায়ের মুখে হাসি আর ধরে না। একান্তে, কন্যাকে ডাকিয়ে আনলেন।

এদিকে, কন্যের মনে তো ঘোরতর সন্দেহ। অতিথির হাত কেন দস্তানায় ঢাকা? মাঝরাতের সেই মুখ হয়তো মিলছে না ঠিকঠাক, তা সাজগোজের ছদ্মবেশে অমিল আনা কীইবা কঠিন কাজ? লোকটি বিদায় হতে না হতেই সে কথা সে বলল তার বাবাকে। এ যে সেই খুনে ডাকাতটা গো!

ভিনদেশি বণিক ওই সামান্য আলাপেই নানান মন-ভোলানো কথাবার্তায় রাজামশায়ের চিত্ত জয় করে নিয়েছে। চোখ ধাঁধিয়েছে ধনরত্নের ঝলমলানিতে। হবু জামাই হঠাৎ এইভাবে হাজির— এই ভাবে বিভোর হয়ে কন্যের কথায় তিনি কানই দিলেন না।

এর পরের কথাগুলো সংক্ষেপে সারা যাক। বাবার বিচিত্র ও অভিনব শাসন এড়াতে এবং তাঁর আজ্ঞা মান্য করতে তো বটেই, কন্যে বিয়েতে রাজি হলো। শুভদিনে শুভক্ষণে বেশ দ্রুতই মিটে গেল সব কাজ। এমনিতেই রাজামশাই ব্যয়কুণ্ঠ, তাছাড়া বণিকেরও তো কাজকর্ম আছে, উপার্জনের রাস্তা বন্ধ করে বেশিদিন তো তিনি ছুটি কাটাতে পারেন না! সময় নষ্ট মানে উপার্জন নষ্ট। সুতরাং, নববিবাহিত দম্পতির গাড়ি চলল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দূরে, আরও দূরে...

বড় রাস্তা ক্রমে মিশল সরু অরণ্যপথে। এই জঙ্গলে বুঝি শ্বশুরবাড়ি? জিজ্ঞেস করার আগে, চারদিক যখন বেশ নিঝুম হয়ে এসেছে, তখন বর তার নতুন বউকে বলল, দস্তানা দুটো এইবার টেনে খোলো তো দেখি...

বলামাত্রই কাজ সারা। কবজি থেকে একটা হাত নেই। যা আশঙ্কা করছিল, তা-ই সত্যি হয়েছে দেখে রাজকন্যে তো ভয়ে কাঠ! আর্তনাদ করে ওঠে সে। বর-বেশী ডাকাত শান্তভাবে বলে, চেঁচামেচি করে যে কোনও লাভ নেই, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ! জঙ্গলে কেউ শুনতে পাবে না। তুমি এখন আমার জিম্মায়। আর আমি যে আসলে কে, সে তো জানোই, কাজেই...

অরণ্যের অন্ধকার শেষ প্রান্তে সেই খুনে-ডাকাতের ডেরা। সে নিজেই বুঝিয়ে বলল, খুন-জখম-রাহাজানি-চুরি-ডাকাতি করে এতদিন যা ধনরত্ন জমিয়েছি, সব এখানেই আছে। এবার থেকে এসব তুমি পাহারা দেবে, সেজন্যই বিয়ে করে আনলাম...

খুঁটোয় বাঁধা গবাদি পশু বা গলায় বকলস বাঁধা পোষ্যেরই মতন বাড়ির সামনের বারান্দার থামে রাজকন্যেকে আলগাভাবে বেঁধে রেখে বেরিয়ে গেল লোকটা। নতুন পরিস্থিতিতে বেশ ঘাবড়ে গেলেও কন্যে কিন্তু পুরোপুরি দিশেহারা হয়নি। সে খেয়াল করেছে, উঠোন পেরিয়ে অল্প দূরেই সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সেখানে কখনও কখনও ভেসে চলেছে পণ্যবাহী জাহাজ। নিজের লাল ওড়না উড়িয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় সে।

বারংবার অমন করতে করতে, শেষমেশ একদিন সত্যিই নাবিকদের দূরবীনে তাকে দেখা গেল। সাহস করে তীরে এসে নৌকাও ভেড়ালো তাদের কয়েকজন। কন্যেও চোখের জলে ভেসে তাদের শোনাল তার দুর্গতির গল্পসল্প। দেখিয়ে দিল খুনে ডাকাত বরের ধনভাণ্ডার। মহা উল্লাসে সেসব বেঁধেছেঁদে নিয়ে, কন্যের বাঁধনও তারা খুলে দিল। কিন্তু একা একা সে বেচারিই বা এখন কোথায় যাবে? শেষে নাবিকরা তাকেও জাহাজেই তুলে নিল। তুলোর বস্তাভর্তি সেই জাহাজ তখন চলেছে ভিনদেশে। সেই তুলোর মধ্যে ধনরত্ন তো ঢোকানো হলোই, আর উপায় যখন নেই, তখন লুকিয়ে রাখা হলো রাজকন্যেকেও।

ইত্যবসরে সেই খুনে ডাকাত তো ডেরায় ফিরে এসেছে। ফিরে এক পলকেই সে বুঝে নিয়েছে, কী হয়ে থাকতে পারে। ঘরদোর সব লণ্ডভণ্ড, কিন্তু...কিন্তু পালাতে গেলে তো সমুদ্র ছাড়া উপায়ও নেই! জঙ্গলটা নানান হিংস্র জীবজন্তু নিয়ে প্রায় প্রাচীরেরই মতন— ঘাঁতঘোঁত চেনা সোজা নয়, তাহলে তো তারই চোখে ধরা পড়ত। আচ্ছা ওই দূরে একটা জাহাজ যাচ্ছে না?

খুনে ডাকাত কিন্তু নৌকা বাইতেও ওস্তাদ। নিজের ডিঙি নৌকাটা নিয়ে চটপট সেই জাহাজটার একেবারে ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল সে। চেঁচিয়ে বলল, নামাও তুলো! সবকটা বস্তা আমি খুলে দেখব...

মহা মুশকিল! নাবিকরা ভাবছে, এবার বুঝি ধনেপ্রাণে মরতে হয়। বুদ্ধি খাটিয়ে একজন বলে, আমাদের কি ভাতে মারতে চান? জলের মধ্যে বস্তা খুলব, মানে? আপনার যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তাহলে চলে আসুন এখানে, বস্তায় তলোয়ার চালিয়ে দেখে নিন ভেতরে কিছু আছে, বা কাউকে লুকিয়ে রেখেছি কী না!

তলোয়ার দিয়ে তুলোর বস্তা এ ফোঁড়-ওফোঁড় করার সময়ে অল্পস্বল্প আঘাত কিন্তু রাজকন্যের লেগেছিল। তবু সে বেঁচে গেল ওই তুলোর বস্তার জন্যই। ডাকাতের তলোয়ারের আঘাতে যতবার রক্ত বেরিয়েছে, সে রক্ত তুলোতেই মুছে যাচ্ছিল। ক্ষিপ্ত ডাকাতকে

নাবিকরা শেষমেষ বোঝালো, দেখুন, এই সমুদ্রে শুধু যে আমাদের জাহাজই রয়েছে তা তো নয়, ওই দেখুন না, সামনে আরেকটা...ওরাও তো আপনার বউকে নিয়ে ভেগে যেতে পারে...ওদিকেই বরং দেখুন গিয়ে...

ডাকাতও আর দেরি না করে দ্রুত ধাওয়া করল অন্য জাহাজের দিকে। আর যাতে কোনও ঝামেলায় না পড়তে হয়, তার জন্যে নাবিকরাও ফন্দি আঁটল, মেয়েটিকে সামনের যে কোনও নিরাপদ বন্দরে নামিয়ে দেবে। তার আগে অবশ্য অনেকদিন রমণীসঙ্গ বঞ্চিত নাবিকরা কন্যেটিকে নিয়ে কতভাবে কত কী খেলাধুলো করল, সেসব অ্যাডাল্ট গল্প, তাই বিশদ বিবরণে লাভ নেই। মেয়েটা যে প্রাণে বেঁচে রইল, এই না কত! সে যদিও প্রচুর কান্নাকাটি করেছিল, এর চেয়ে বরং জলেই ফেলে দাও আমাকে... সমুদ্রের জলে চুবিয়ে মারো...এইসব বলে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! ধনরত্ন তো যা পাবার, যথেষ্ট পাওয়া গেছে। এবার আর কি, পথি নারী বিবর্জিতা!

যাই হোক, সবাই তো আর একরকম নয়। সেই নাবিকদের মধ্যেই ছিল বয়স্ক একজন, কোনও ছেলেপুলে নেই বলেই সে জলে ভেসে বেড়ায়। সেই চাইল, মেয়েটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতে। ভরণপোষণের জন্য অবশ্য লুঠের ধনরত্নের ভাগও সে বেশি চাইল। যাই হোক, সবাই রাজি। বয়স্ক নাবিকের বউও বেশ খুশি এই মেয়েটিকে পেয়ে, নিজের মেয়ের মতন করেই একে দেখবে সে।

স্নেহ-ভালোবাসার ধরন মেয়েরা খুব ভাল বোঝে। আশ্রয় পেয়ে আনন্দে ও নির্ভরতার স্বস্তিতে জল এল মেয়েটির চোখে। বলল, প্রাণে বেঁচে আছি, আশ্রয় পেয়েছি, এটাই যথেষ্ট। আর শুধু একটিমাত্র জিনিস চাইব। দয়া করে এই অনুরোধটুকু অন্তত রাখুন! সবসময়ে আমি ঘরের ভেতরেই থাকব। কেউ যেন আমাকে দেখতে না পায়। বিশেষ করে বাইরের কোনও পুরুষ মানুষ—

—কোনও চিন্তা নেই। আমাদের বাড়িতে আসেই না কেউ! বাইরের পুরুষ তো নয়ই— নাবিক বলল।

পড়ে-পাওয়া ধনরত্নের কিছুটা কাজে লাগল পড়ে-পাওয়া কন্যেরও। আদতে তারই তো স্ত্রীধন—সেসব অবশ্য সে কবুল করেনি কখনও। নাবিক কিনে আনে নানান রঙের রেশমি সুতো, তাই দিয়ে মেয়েটি অসাধারণ সুন্দর সূচীশিল্প করে। এই সৃজনশীল এমব্রয়ডারির কাজ। সেসবের কিছুটা বাইরে বিক্রিও করে তার নাবিক-বাবা। প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। মেয়ের হাতের কাজ নিয়ে নাবিকের বউ একদিন পৌঁছে গেল খোদ রাজবাড়িতে। দেশের রাজামশাই মেয়ের হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ। বললেন, এসব কে করেছে?

—আমার ঘরের মেয়ে, রাজামশাই!

—উঁহু! এ কাজ তো নিছক কোনও নাবিকের ঘরের মেয়ের হতে পারে না! মনে মনে ভাবেন রাজামশাই। রং ব্যবহারের মেজাজটা যেমন রাজসিক, তেমনই শিল্পের বিষয়বস্তুও। ময়ূর আর কোথায় পোষা হয় রাজবাড়ি ছাড়া? আর এইসব আলপনার ডিজাইনও যেন রাজঅন্তঃপুরের আভাস আনছে! রাজা অনেকগুলো কাজ কিনে নিলেন, উপঢৌকনও দিলেন দু-হাত ভরে। সেসব ব্যয় হলো আরও রেশম কেনার কাজে। শিল্পকর্ম উৎসাহ পেয়ে সমৃদ্ধ হতে থাকল আরও, এবং রাজামশাইও সেসব কিনলেন খুশি মনে। মনের ভেতর ধন্দ তবু কাটে না, নাবিকের ঘরের মেয়ে এইসব চিত্রকল্প কোথা থেকে পেল? কল্পনা তো বাস্তবের মাটি থেকেই ডানা মেলে ওড়ে, তাই তো?

একদিন রাজামশাই চুপি চুপি নাবিক-বউয়ের পিছু নিলেন। নিজের পাড়ায় পৌঁছে, যখন প্রায় নিজের বাড়ির উঠোনে সে পা দিতে চলেছে, তখন আচমকা পেছনে চেয়ে, রাজামাশাইকে দেখে, অস্ফুট আর্তনাদ জাগল তার কণ্ঠে। রাজা হয়তো নিজেকে লুকোতে চাননি। ওদিকে অন্দরে বসে মায়ের আর্তনাদ শুনে সে-মেয়ে ভেবে বসল, সেই খুনে ডাকাতই ফিরে এল বুঝি! ভয়ে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে সে এক কাণ্ড।

নাবিক-বউ আর রাজামশাই দুজনে মিলে তো অনেক চেষ্টা করে কন্যের জ্ঞান ফেরালেন। চোখ খুলে মেয়েটি যেই দেখল একটি প্রসন্ন হাসিমুখ তার নাবিক-মায়ের পাশে, দ্রুত সে চেতনায় ফিরল।

—আরে, এত ভয় কিসের তোমার? রাজা উদগ্রীব হয়ে জানতে চান। পুরো ব্যাপারটাতে নাবিক-বউ বড়ই বিব্রত, তাও সে বলতে থাকে, আমার পোড়া কপাল, নইলে এইসব অসুখ-বিসুখ...এর বেশি কিছু বলতে সে সাহস পায় না।

রাজার চোখে কিন্তু গুণবতী রাজকন্যের চেহারায়, উজ্জ্বলতায় উঁচু বংশ আর সমৃদ্ধ শৈশবযাপনের ছাপ ঠিকই ধরা পড়েছে। তার হাতের কাজ তিনি আরও দেখতে চাইলেন। কীভাবে সে কাজ করে, সেই পদ্ধতিটাও তাঁকে দেখাতে হবে— এই অছিলায় প্রায় রোজই তিনি আনাগোনা আরম্ভ করলেন ওই বাড়িতে। তারপর যা হবার তাই হলো, রাজামশায়ের মনে প্রণয়ের সঞ্চার হলো, বিবাহ প্রস্তাব গেল বয়স্ক নাবিকের কাছে। বিস্ময়ে অভিভূত দম্পতির চোখে তো আনন্দাশ্রু বাঁধ মানে না। কোনওরকমে তারা বলে, রাজামশাই, আমরা খুব সাধারণ গরিব মানুষ...

—গরিব? তাতে কার কী? আমার তো আগ্রহ কেবল মেয়েটিকে নিয়ে!

কন্যে এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবার নিজে থেকেই বলল, হ্যাঁ, আমি রাজি বিয়েতে। তবে আমারও একটা শর্ত আছে।

—বেশ বেশ, বলো! শুনি সেটা কী—

—আপনি, মানে আমার স্বামী, আর আমার বাবা ছাড়া আর কোনও পুরুষের সামনে আমি বেরোব না। আমায় কেউ দেখুক আমি চাই না... সে তিনি যেই হোন বা যে পরিস্থিতিই হোক। কোথাও কখনও আমি দেখা দেব না—

একথা শুনে রাজার মন বেশ খুশি-খুশি। এই বয়স্ক নাবিক আর তাঁর নিজের চেহারাটি ছাড়া আর কোনও পুরুষকে নিজের মুখ দেখাতে চায় না, দেখতেও চায় না নতুন বউ— এক ধরনের লাজুকতাই হয়তো, সৃষ্টিশীল মনের খেয়াল— তা এ আর মন্দ কী? ব্যাস, এত গোপনে বিয়েটা হয়ে গেল যে কাকপক্ষীতেও টের পেল না।

রাজার অনুচর-সহচররা অবশ্য মুখে কিছু না বললেও, এই হঠাৎ- বিয়ের রকমসকম দেখে মোটেও খুশি হয়নি। রঙ্গরসিকতা না

হয় নাই পছন্দ হলো, নতুন বউ বলে কথা, তার মুখ কেউ দেখতে পাবে না, এ আবার কী? এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেউ শুনেছে কখনও?

বিচিত্র সব গুজব রটতে লাগল চারদিকে। রাজপ্রাসাদের লোকজন থেকে শুরু করে প্রজাদের মধ্যেও অনেকে বলাবলি করতে থাকে, রাজার বিয়ে হয়েছে নির্ঘাত কোনও বাঁদরির সঙ্গে। কেউ বলল, আরে না, তা কেন— নতুন বউটা নির্ঘাত কোনও ডাইনি-টাইনি হবে, দ্যাখো গিয়ে, রাজের অন্ধকারে হয়তো নেকড়ে বাঘ কী বাদুড়-টাদুড় হয়ে যায়...। কেউ বা সঙ্গে সঙ্গেই বেজায় আপত্তি জুড়ে বলে, না গো না, ওসব কেন হতে যাবে! আসলে খুব কুচ্ছিৎ দেখতে কী না, তার ওপর পিঠে আবার কুঁজ-টুঁজও কিছু বোধহয় আছে, তাই নিশ্চয়...

পাত্র-মিত্র-অমাত্য-সুজন-অভাজন সকলের মধ্যেই যখন এইরকম শোরগোল শোনা যেতে লাগল তখন রাজামশাই শেষমেশ প্রাণের দায়ে তাঁর প্রাণপ্রিয়া রানিকে গিয়ে বললেন, এ তো দেখছি মহা উৎপাত! রাজকার্য যে মাথায় উঠল! এসব বন্ধ করতে, অন্তত একটি ঘণ্টার জন্যে মানুষের সামনে তোমার না এলে তো আর চলে না দেখছি। না হয় অনেকটা দূর থেকেই— নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে থেকে...

বেচারির আর উপায় কী! রাজ্যের অমন অচলাবস্থা এলে আর তো চুপচাপ বসে থাকা যায় না— অতএব শর্ত ভাঙতেই হয়। নিমরাজি হয়ে কন্যে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক! আগামীকাল সকাল এগারোটায় না হয় ডাকো সবাইকে। রাজপ্রাসাদের ছাদে আমি থাকব, চারদিকে ঘোষণা করে দাও—

প্রাসাদের সামনে সেদিন ব্যাপক হৈ-হট্টগোল। সকাল থেকেই লোকজন জড়ো হতে শুরু করেছে। বেলা এগারোটায় তো একেবারে জনসমুদ্র! আর সে সমুদ্র হর্ষধ্বনিতে রীতিমতো হিল্লোলিত হয়ে উঠল যখন রাজকন্যে, মানে এখন যিনি রাজরানি, হেঁটে এসে দাঁড়ালেন ছাদের প্রান্তে। রানি এমন সুন্দর দেখতে, আর তাঁকে নিয়েই কিনা এত গুজব? জনগণ কিন্তু অতখানি দূর থেকে খেয়ালই করেনি রানির মুখের সামান্য অস্বস্তিটুকু। কেন অস্বস্তি? আরে, কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে কে যেন একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে না, ওই দূরে! স্পষ্ট বোঝা যায় না বলেই আতঙ্ক যায় বেড়ে। রানি মুখের ঘাম মোছেন একবার, তারপর যেন আতঙ্কেই মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। ধরাধরি করে তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো।

অন্তঃপুরচারিণী গুরুজন মহিলারাও বিরক্ত। বলেন, শর্তভাঙা, খুব অন্যায়! শর্ত ভাঙতে জোরাজুরি করা হলোই বা কেন? সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছিল? নাও, এখন ঠেলা সামলাও! অসুখের রকম-সমক দেখে স্বয়ং রাজবৈদ্যও ঘাবড়ে গেলেন। রানি সারাক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখছেন, ওদিকে হাত-পায়ের কাঁপুনিও থামছে না!

এরই মধ্যে বিদেশি এক ভদ্রলোক, কথাবার্তায় দারুণ চৌকস, দেখা করতে এসেছেন রাজামশায়ের সঙ্গে। ধনিক-বণিক এমন অনেকেই আসেন। খাইয়ে-মাখিয়ে, ককটেল পার্টি থ্রো করে সুবিধে আদায়ের ধান্দাও থাকে অনেকের। রাজামশাই ওসব বোঝেন না কি আর? বড় মানুষ বলে কথা, তাই অনেক সময়ে বুঝেও কোনও উপায় থাকে না। তাছাড়া যেতে এসে উপঢৌকন দিলে কতক্ষণই বা মুখ ফিরিয়ে থাকা যায়!

যাই হোক, ব্যাপক নৈশভোজের আয়োজন হলো। আর, ফের সংক্ষেপেই বলা যাক, আন্দাজ করেছ নিশ্চয় যে ওই বিদেশি অতিথি আসলে সেই খুনে ডাকাতটাই। তো, সুরার ফোয়ারা ছোটাল সে, সেই ফোয়ারার বিন্দুতে বিন্দুতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঘুমের ওষুধ! শান্ত্রী-সেপাই-পাত্র-মিত্র-অমাত্য সক্কলে গড়াগড়ি খেতে লাগল রাত একটু বাড়তে না বাড়তেই। নাক ডাকার সমবেত আওয়াজে মনে হচ্ছিল যেন যুদ্ধ হচ্ছে! সব্বার আওয়াজ ছাপিয়ে যাচ্ছে খোদ রাজামশায়ের নাকের ডাক। আর সেই সুযোগে, রাজপ্রাসাদের সিঁড়িতে-বারান্দায় বেড়ালের মতো নিঃশব্দে চষে বেড়াতে লাগল সেই খুনে ডাকাত। প্রতিটি ঘরে সে উঁকি দেয়। স্বাভাবিক, কারণ দরজা-টরজা খুলেই তো আজ ঘুমোচ্ছে সব্বাই। এবং শেষ পর্যন্ত এভাবে চষতে চষতেই লোকটা এসে পৌঁছয় অন্দরমহলের সেই ঘরে, যেখানে সমস্ত রাত চোখ খুলে বসে আছেন রানি।

কেন যেন লোকটার মনে হলো, রানি যেন একরকম পথ চেয়েই প্রায় বসে ছিলেন, এবং কাল গুনছিলেন, কখন সে আসবে! হিসহিসে গলায় রানিকে সে বলে— যাক, এতদিনে তাহলে আমার প্রতিশোধ নেবার সুযোগটা অন্তত এল। যাই হোক, যাও তো, এক গামলা জল নিয়ে এসে এখানে রাখো তো! তোমার মুণ্ডুটা কাটার পর হাত-টাত ধুয়ে, একটু সাফসুতরো হয়ে তবে তো এখান থেকে বেরতে হবে—

রানি তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করলেন রাত্রির স্তব্ধতা চিরে। তবু কারুর ঘুম ভাঙল না প্রাসাদে। রাজামশাইকে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিলেন রানি। তিনি ফের পাশ ফিরে শুয়ে নাক ডাকাতে থাকলেন। অগত্যা কী আর করা, এক গামলা জল রানিকে এনে রাখতেই হয়।

—আহা, একটু সাবানও আনবে তো! কী যে করো...ছুরি শানাতে শানাতে লোকটা বলে। রানি ফের বেরিয়ে গিয়ে শোবার ঘরে রাজাকে ধাক্কা দেন, রাজা আবারও পাশ ফিরে শোন। অগত্যা নিরুপায় রানি সাবান নিয়ে দেবেন।

—ওহ্, কত কী যে শেখাতে হবে তোমায়...সব আনলে, আর তোয়ালেটাই বাদ? কে আনবে ওটা? লোকটাকে এবার যথার্থই বিরক্ত দেখাল। এবার বেরিয়ে রানি তাঁর নিদ্রিত কর্তার কোমরবন্ধে হাত দিলেন। রিভলবারটা বার করলেন এক টানে, তারপর সেটা মুঠোয় ধরে হাতে তোয়ালে চাপা দিলেন। সোজা হেঁটে এলেন নিজের মহলে। লোকটা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। চোখের ইশারায় রানি তাকে বললেন হাত থেকে তোয়ালেটা নিতে। লোকটা এগোতেই, ব্যস। একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কে গুলিটা চালিয়েই দিলেন রানি। সোজা বুকে গিয়ে লাগল।

হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় হবার কোনও শব্দ হয় কী? হয় বোধহয়, নইলে এবার তাহলে রাজপ্রাসাদের কারও কারও ঘুম ভাঙল কীভাবে?

হ্যাঁ, মেয়েটির ভয়, অবশেষে, এইবার ভেঙেছে! ■



নারী শক্তিরূপেণ সংস্থিতা

সুতপা বসাক ভড়

কল্যাণী থানায় কর্মরতা মহিলা পুলিশের সঙ্গে আলাপের পর পুলিশ সম্পর্কে চিরাচরিত ধারণা পালটে গেল। সাধারণত আমরা থানা-পুলিশকে এড়িয়ে চলতেই পছন্দ করি। সেদিন কোনও এক প্রয়োজনে থানার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে কয়েকজন পুলিশকর্মীর অসহযোগিতার ভাবই চোখে পড়ল। এমন সময় একজন দীর্ঘাঙ্গী সুঠাম চেহারার রাইফেলধারী মহিলা এগিয়ে এসে আন্তরিকতার সঙ্গে জানতে চান যে, আমরা কী কারণে এসেছি। একটু অপেক্ষা করতে বলে নিজেই উদ্যোগী হয়ে বড়োবাবুর সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে দেন। ফেরার সময় মিষ্টি হেসে জিজ্ঞাসা করেন কাজ হয়েছে কি না। পুলিশের পক্ষে এই ব্যবহার সেদিন অসাধারণ ও অভূতপূর্ব মনে হয়েছিল। ওই মহিলা পুলিশকর্মীকে দেখে মনে হয়েছিল রাইফেল এরকম পুলিশকর্মীর হতেই মানায়। পুলিশকর্মীরা সবাই যদি এরকম হতেন তাহলে সমাজের চিত্রটাই পালটে যেত।

আর একটি ঘটনা। দূরপাল্লার ট্রেনে যাত্রী সুরক্ষার জন্য রেল পুলিশ আমরা দেখে থাকি। কেউ শুধু হকারদের সঙ্গে গল্প করেন, প্রায় বিনা পয়সায় খাবার খেয়ে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আবার কেউ টুপি নামিয়ে, জামার বোতাম খুলে, কোমরের বেল্ট ঢিলে করে, এসি বার্থে ঘুমিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এর ব্যতিক্রম দেখেছিলাম এক অল্পবয়সি মহিলা রেল পুলিশের ক্ষেত্রে। অনবরত তিনি এ কামরা সে কামরায় ঘুরছেন আর ট্রেন থামলেই দরজায় এসে যাত্রীদের ওঠা-নামায় সহযোগিতা করছেন। সহযাত্রী এক মহিলা তাঁকে নিজের আসনে বসালেন এবং মাঝে মধ্যে একটু বিশ্রাম নেওয়ার উপদেশ দিলেন। আলাপ পরিচয়ের পর জানলাম, দেড় বছর হলো তিনি এই কাজে যোগ দিয়েছেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালনের চেষ্টা করে চলেছেন। উত্তর প্রদেশের সাধারণ ঘরের এই অসাধারণ মেয়েটিকে দেখে তথাকথিত রেল পুলিশ সম্পর্কে ধারণাটাই পালটে গেল।

কল্যাণী থানার মহিলা পুলিশকর্মী এবং মহিলা রেল পুলিশকর্মী দু'জনেই সাধারণ পরিবার থেকে এসেছেন। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে, তাঁরা শক্তিরূপিণী। তাঁদের মধ্যে ভয় দেখিনি, পদের দম্ভ দেখিনি। দেখেছি মাতৃরূপে রক্ষাকর্ত্রীর ভূমিকায়। এই ভূমিকায় মেয়েদের দেখলে সত্যিই খুব ভালো লাগে। অথচ আমরা আমাদের ঘরের মেয়েদের পুলিশ কিংবা সামরিক বা আধা সামরিক বাহিনীতে পাঠাতে কুণ্ঠা বোধ করি। এসব বাহিনীতে যদি মেয়েরা পুরুষের সমান সমান থাকত তাহলে সমাজের চিত্রটাই বদলে যেত। কারণ এতে মহিলা এবং সমাজ দুই-ই অনেক বেশি সুরক্ষিত থাকত। সমাজ অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত।

আনন্দের কথা, বিমানে পাইলটদের মধ্যে আজকাল মহিলারাও আছেন। যাত্রার সময় পাইলটদের নাম ঘোষণা করা হয়ে থাকে, তাতে মহিলা পাইলটদের নাম জানা হয়ে যায়। বিমানে যাঁরা ভ্রমণ করেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, মহিলা পাইলটরা খুব যত্নের সঙ্গে দায়িত্ব সহকারে বিমান চালান। ওঠা-নামা বা আকাশে থাকাকালীন চমৎকার ভারসাম্য তাঁরা রাখতে পারেন। মায়ের মমতায় তাঁরা স্বস্তি এবং শান্তির সঙ্গে অনেক মানুষকে তাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেন।

উত্তর প্রদেশের কানপুর শহরের দাদনগর শিল্পাঞ্চলে একটি পেট্রলপাম্পে মহিলারাই শুধু পেট্রল ভরানোর কাজ করে থাকেন। সেখানে কর্মরতা নিশা, আরতি, শিলাকে দেখে কেউ ভাবতে পারবে না যে, এগুলি এক সময় পুরুষদেরই কাজ ছিল। সমস্ত কাজ তাঁরা অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে করে থাকেন। কানপুরের মেয়ে প্রিয়াংকা পাল ই-রিকশা চালিয়ে ছোটো ভাই-বোনদের মানুষ করছেন। অতি সম্প্রতি ভারতীয় পূর্ব রেলের মাতৃভূমি স্পেশ্যালের সঞ্চালন থেকে সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করছেন মহিলারা। আজ জল-স্থল-অন্তরিক্ষে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পদচারণা করে চলেছেন মেয়েরা। তথাকথিত পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এরা অনায়াসে স্বাভিমান ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন— এদের উপেক্ষা করার সাধ্য কার?

নারীর ক্ষমতায়নের পথে মাতৃশক্তির অভ্যুদয় সমাজের মঙ্গলার্থেই। স্ব স্ব ক্ষেত্রে মহিলারা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কল্যাণময়ী মাতৃশক্তির আবির্ভাবের উপযোগিতা আজ সমাজ, দেশ প্রত্যক্ষ করছে। তাই পরিবারের মাতৃশক্তিকে আর অবহেলা নয়। শিশুকন্যা জন্মালে তাকে 'মানুষ' হিসেবেই বরণ করে নিতে হবে। কারণ, এ প্রমাণিত সত্য— নারী শক্তিরূপিণী। ■

প্রাথমিক চিকিৎসা বা ফার্স্ট এইড

হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়লে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত যে চিকিৎসা করা হয় তাকে বাংলায় প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ইরেজিতে



ফার্স্ট এইড বলা হয়। তবে আমরা অনেকেই জানি না যে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে গেলে কী করতে হয়। জেনে রাখা ভালো যে, প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে কয়েকটি জিনিসের ওপর বেশ নজর দিতে হবে। ইংরেজি First Aid কথাটির মধ্যেই বিষয়গুলো অন্তর্নিহিত রয়েছে।

বস্তুত লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমন F-First, প্রথম। I- Investigation অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা পরীক্ষা করে বুঝতে হবে। R-Relief অর্থাৎ আহত ব্যক্তির যন্ত্রণা উপশমের ব্যবস্থা করতে হবে। S-Symptom অর্থাৎ রোগের লক্ষণ খুঁজে বের করতে হবে। T-Treatment অর্থাৎ রোগের লক্ষণ বের করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। A-Arrangement অর্থাৎ কী করলে রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে তার ব্যবস্থা করতে হবে। I-Immediately অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। D-Disposal অর্থাৎ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা কী করা যায় তা স্থির করতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসার নানা সরঞ্জাম প্রতি গৃহে, বিদ্যালয়ে, ক্লাবে, যানবাহনে হাতের কাছে থাকা দরকার। কারণ যেকোনও সময় যেকোনও ধরনের বিপদ বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের সবার বাড়িতে ফার্স্ট এইড বক্স রাখা প্রয়োজন। বক্সে রাখতে হবে ঃ স্টিকিং প্লাস্টার (আঠালো ফিতে), ক্রেপের গুটানো ব্যান্ডেজ, বোরিক পাউডার, লাল ওষুধ, চিমটে, তুলো, কাঁচি, স্মেলিং সল্ট ইত্যাদি।

জার্মানির বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ফেড্রিক এজমার্ক হলেন ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক প্রতিবিধানের স্রষ্টা। দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে একটা প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনের কথা তিনি জানিয়েছিলেন। তিনি শুধু ভাবনাচিন্তা করেই বসে থাকেননি, তা বাস্তবে রূপায়িত করেন এবং মানুষের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দেশগুলিতে গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকত। যুদ্ধে আহতদের সেবা-শুশ্রূষা বা সাহায্য করার জন্য কেউ ছিল না। তারা প্রায় বিনা সেবা ও বিনা শুশ্রূষায় মারা যেত। এজমার্ক প্রথম এগিয়ে আসেন তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করার জন্য। এরপর ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও এলিজাবেথ ফ্রাঙ্কো এগিয়ে আসেন সেবার কাজে।

একটি প্রয়োজনীয় কথা জেনে রাখা ভালো যে, ঘরে-বাইরে দুর্ঘটনা ঘটে ও ঘটবেও। তাই এই সমস্ত ক্ষেত্রে সময়মতো প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিতই, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কিছু মানুষ নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে গিয়ে দুর্ঘটনা-পীড়িত ব্যক্তিকে সঠিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারে না। ফলে সেই ব্যক্তির অবস্থা হিতে বিপরীত হয়ে যায়। কাজেই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারে কোন দুর্ঘটনায় কীরকম ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা খুবই জরুরি।

(সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

তাঞ্জাভুর



চোল রাজাদের রাজধানী ছিল তাঞ্জাভুরে। কিন্তু তারও আগে সঙ্গম যুগেই তাঞ্জাভুরের প্রশস্তির কথা ইতিহাসে মেলে। চোল বংশের অন্যতম রাজা রাজনের যুদ্ধ জয়ের স্মারক রূপে তাঁর অবিনশ্বর কীর্তি হলো শ্রীবৃহদেশ্বর মন্দির নির্মাণ। চোল রাজাদের গৌরবময় অতীত বিনষ্ট হলেও বর্তমানে তাঁদেরই তৈরি ৭৪ টি মন্দির রয়েছে তাঞ্জাভুরে। ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যের অনুপম নিদর্শন শ্রীবৃহদেশ্বর মন্দির। ব্রিটানিকা এনসাইক্লোপিডিয়াতে এটি ভারতের সুন্দরতম মন্দির বলে উল্লিখিত রয়েছে। মন্দিরের ভিতরের গোপুরমে স্কন্দপুরাণের নানান আখ্যান ছাড়াও শিব-পার্বতীর বিবাহ-দৃশ্য মূর্ত হয়েছে। মূল মন্দিরে ৩.৫ মিটার উঁচু শিবলিঙ্গ নিত্য পূজিত হয়। মন্দির থেকে দু'কিলোমিটার দূরে ৩৫ একর ব্যাপ্ত শিবগঙ্গা দুর্গ বা রয়্যাল প্যালেস অবস্থিত। রয়েছে সংগীত মহল বা জলসাঘর। সারা বছর পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে।

জানো কি?

- নবরাত্রির ৯ দিন যে ৯ জন দেবীর পূজা হয় ঃ শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী এবং সিদ্ধিদাত্রী।
- দুর্গাপূজায় নবপত্রিকা বা কলাবউ সাজানো হয় যে ৯ টি গাছ দিয়ে ঃ কলা, কচু, হলুদ, মানকচু, ডালিম, ধানগাছ, জয়ন্তী, বেল এবং অশোক।
- দেবী দুর্গার আরাধনার কথা মেধামুনির কাছে প্রথম শোনেন রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য।
- দেবী দুর্গার আরাধনা করেই শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধ সম্পন্ন করেন।

ভালো কথা

পুজোয় রাস্তার ভাই-বোনেদের সঙ্গে আনন্দ

আমাদের ক্লাবে এবার অভিনব পদ্ধতি প্রযোগ করা হবে। শুনেই খুব আনন্দ হচ্ছে। গতকাল ক্লাব থেকে পাড়ার টিন এজারদের ডাকা হয়েছিল। একশো বাইশ জন উপস্থিত হয়েছিলাম। শ্যামলকাকু কোনওরকম ভনিতা না করেই বললেন, কারা কারা এবার কত সেট পুজোর পোশাক পেয়েছ। হিসেব করে দেখা গেল বাহান্ন জন দু'তিন সেট করে পেয়েছে। শ্যামলকাকু বললেন রাস্তায় থাকা আমাদের বাহান্ন জন ভাই-বোনকে পঞ্চমীর দিন সকাল দশটায় নতুন পোশাক দেওয়া হবে। কাকে কাকে দেওয়া হবে তা দু'দিন আগে ঠিক করা হবে। তিনি বললেন সেদিন কিন্তু একশো বাইশ জনকেই হাজির থাকতে হবে। পঞ্চমীর দিন কীরকম আনন্দ হলো তা পুজোর পরে নবাঙ্কুরের বন্ধুদের জানাবার ইচ্ছা রইল।

রতন দাস, দশম শ্রেণী, ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ত্র ম প নো য় ন	(১) ক সা শা পো জ
(২) ঙ্খ লা ণ প শ্ রা	(২) তি মি ণ কো ত্রি

২৪ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) অনিমেষলোচন (২) আবহসংগীত

২৪ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) জনকনন্দিনী (২) জনসমাবেশ

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯। (২) স্বপ্না নাথ, বসিরহাট, উঃ ২৪ পরগনা (৩) স্নেহা পণ্ডিত, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড। (৪) শিল্পী দাশ, ধর্মনগর, ত্রিপুরা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে জমিয়ে খান

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

পুজো দেখতে বেরিয়ে বাইরে খাবেন না তা কি কখনও হয়? ডাক্তার হিসেবে আমি বলি, অবশ্যই খাবেন। শুধু রেস্তরাঁ কেন, ফুটপাতের বিপিন-পল্টুদের দোকানের খাবারও খেতে পারেন। বাইরে যে খাবারই খান না কেন, তা যেন টগবগে গরম অবস্থায় পরিবেশন করা হয়। গরম গরম খেলে ক্ষতির আশঙ্কা তেমন একটা থাকে না। মোমো, চপ, কাটলেট পোলাও, মাংস, চাউমিন, চিলি চিকেন, বিরিয়ানি, রুটি-তরকা— যার যেমন খুশি খেতে পারেন। স্যালাড খাওয়া যাবে যদি আপনার সামনে কাটা হয়। অন্যথায় স্যালাড এড়িয়ে চলাই ভালো। একই কথা বলা যায় চিলি, টমেটো সস ইত্যাদি সম্পর্কেও। খাবেন না চরণামৃতও। নিতান্ত বেগতিক দেখলে জিভে ঠেকিয়ে সুরুৎ করে একটা শব্দ করে মাথায় মেখে নিন। কথাটা পাষণ্ডমার্কা শোনালেও আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে সুখকর।

রাস্তাঘাটে ভাজা পকোড়া খাবেন না। এগুলো খুব লোভনীয় করে কাঁচের শোকেসে সাজানো থাকে বটে, কিন্তু পেট তো বটেই গোটা শরীরের পক্ষেই এটা বিপজ্জনক। কারণ রাস্তাঘাটে তৈরি পকোড়ায় খেসারির ডাল মেশানো হয়। এর ফলে পক্ষাঘাত হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পকোড়া যে তেলে ভাজা হয় তা ভয়াবহ রকমের ক্ষতিকর, বিষবৎ। একই তেলে পকোড়া বার বার ভাজা হতে থাকলে তা শেষমেশ কী বস্তু হবে, সহজেই অনুমেয়। আন্দাজ পেতে হলে একবার কড়ায় উঁকি মেরে দেখুন, তেলটা কেমন মোবিল মোবিল লাগছে।

তেষ্টায় বুক পেটে গেলেও রাস্তার জল খাবেন না। বাইরে বেরনোর আগে বাড়ির জল সঙ্গে নিন। ডায়ারিয়া, জন্ডিস যা খুশি হতে পারে ভুলভাল জল খেলে। ছিপি আঁটা নামি দামি কোম্পানির বোতলবন্দি যে জল রাস্তায় বিক্রি হয় তা আদৌ বিশুদ্ধ নয়। বছর কয়েক আগে দিল্লির পলিউশন মনিটরিং ল্যাবরেটরির ইনস্পেকটররা দেশের নামি দামি ১৭ টি ব্র্যান্ডের জলের বোতল সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের তৎপরতায় বিশ্লেষণ করে। তাতে দেখা যায় সেই জলে শরীরের পক্ষে সাংঘাতিক রাসায়নিক বিষ রয়েছে। এগুলো জলে মিশেছে খেতখামারে ব্যবহৃত কীটনাশকের অংশবিশেষ হিসেবে। বোতলে প্রাপ্ত বিষের তালিকাটাও খুব মারাত্মক— অর্গানোক্লোরিনস্, গামাহেক্সাক্লোরোসাই-ক্লোহেক্সেন (জি এইচ সি এইচ), ম্যালাথিয়ন, ক্লোরোপার্রিফস ইত্যাদি।



জলের মধ্যে মিশে থাকা এসব বিষ পেটে গেলে ক্যানসার, লিভার ও কিডনির ক্ষতি, স্নায়ুতন্ত্রের সর্বনাশ, গর্ভস্থ শিশুর চরম ক্ষতি, এমনকী শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে। তাই বোতলের জলে ভরসা না করে বাড়িতে জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ভালো পাত্রে নিয়ে বেরোতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্লাস্টিকের বোতলে জল ভরে ফ্রিজে রাখবেন না। এটা খুব ক্ষতিকর। কাঁচের পাত্রে জল রাখুন। পথেঘাটে বেরুলে লেবুজল নিয়ে বেরোন। না হলে ডাব খান। বাইরে বরফ মেশানো যে লেবুজল বা রঙিন শরবত বিক্রি হয়, সেগুলো নৈব নৈব চ।

কোল্ড ড্রিংকস ভুলেও খাবেন না। নামি দামি স্বদেশি থেকে বহুজাতিক হালকা পানীয় কোম্পানির বোতলে যা বিষ থাকে তা ব্যাখ্যা করতে গেলে শারদাঞ্জলির চেয়েও ঢাউস একটা পূজাবার্ষিকী বের করতে হবে। চাইলে গ্রিন টি দিয়ে লিকার বানিয়ে সঙ্গে রাখুন। যাঁরা গাড়ি চেপে ঘুরবেন তাঁরা টাটকা ফলের রস ফ্লাস্কে করে নিয়ে নিন। পুজোর ক'টা দিন বাইরের জলের বদলে দিনে তিন-চার বার করে ফলের রস খান। ভালো ছাড়া মন্দ হবে না। এরপরও যদি পেট খারাপের ভয় থাকে বা বলতে নেই যদি হয়েই থাকে তাহলে নুন-চিনির জল খান। এক লিটার জলে ৬ চামচ চিনি, ১ চামচ নুন মিশিয়ে একটু একটু করে খান(ও আর এস)। এর সঙ্গে যদি পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নেন তো কথাই নেই।

যাঁরা পুজোর ফল কাটবেন, তাঁরা ভালো করে হাত ধুয়ে কাটাকাটি করুন। চালকলা মেশানো যাঁদের দায়িত্ব তাঁদের ক্ষেত্রেও একই পরামর্শ। তামা পেতলের বাসনে ফল, খাবার-দাবার বেশিক্ষণ রাখবেন না। বারোয়ারি পুজোয় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। পরিচ্ছন্নতায় কিন্তু ভালো নম্বর থাকে। এই নিয়মগুলি পালন করুন, পুজো আনন্দেই কাটবে।

(যোগাযোগ--৯৮৩০০২৩৪৮৭/
৯৮৩০৫০২৫৪৩)



সোনা রুপোর মেয়েরা

যদুনাথ ভট্ট

সম্প্রতি সম্পন্ন হলো ১৮তম এশিয়ান গেমস। ভারত সর্বকালীন রেকর্ড ভেঙে ১৫টি সোনা-সহ এ পর্যন্ত সর্বাধিক পদক জিতল। এই সোনা রুপোর কথার মধ্যে রয়ে গেছে হিরের গল্পও। সোনা যেমন বেড় দিয়ে হিরেকে ধরে রাখে, ভারতের সাফল্যকে হীরক দ্যুতিময় করেছে তার সোনার মেয়েরা। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ির মেয়ের কীর্তি অতুলনীয়। পায়ে ছটি করে আঙুল থাকায় বিশেষ ধরনের জুতো কেনার পয়সা ছিল না পরিবারের। স্থানাভাবে শুতে হতো মাটিতে। কষ্ট সহ্য করেছে কিন্তু স্বপ্নের মৃত্যু হতে দেয়নি স্বপ্না বর্মন। মেয়েদের একক দক্ষতা প্রদর্শনের অ্যাথেলেটিকসে সবচেয়ে কঠিনতম হেপ্টাথেলনকেই সে বেছে নেয়। কী নেই সেখানে! ১০০ মিটার হার্ডলস হাই জাম্প, লং জাম্প, শর্ট পাট, ২০০ মিটার দৌড়, জ্যাভলিন থ্রো, সব শেষে ৮০০ মিটারের পর্যাপ্ত দৌড়। দু'দিন ধরে চলা সাত ইভেন্টের এই খেলায় প্রথমদিনেই তার দাঁতে প্রবল যন্ত্রণা শুরু হয়। পরোয়া না করে সেদিনেই সে জ্যাভলিন আর হাই জাম্পে প্রথম হয়ে সার্কিট পয়েন্ট তুলে নেয়। হাইজাম্পে তার ক্রসবার টপকে যাওয়ার সাবলীলতা সকলকে মুগ্ধ করেছিল। আর জ্যাভলিনে এশিয়ার চীন, জাপান, কোরিয়ার প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে তার পরাক্রম না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। শেষ পর্বের দৌড় স্বপ্না যখন শেষ করল তখনই তৈরি হলো ভারতের সর্বপ্রথম হেপ্টাথেলন জেতার অবিশ্বাস্য ইতিহাস। অঙ্কুরিত হলো হাজার স্বপ্নার অবদমিত স্বপ্ন।

স্বপ্নার যেমন যৌথ লড়াই ছিল দারিদ্র্য ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে, তেমনি ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে যুগপৎ রুপো জেতা ছোট্টখাট্ট মেয়ে দ্যুতিচাঁদের লড়াই ছিল প্রবল সামাজিক অসহযোগের সঙ্গে। ওড়িশার প্রত্যন্ত অঞ্চলের চাকা গোপালপুর গ্রামের মেয়েটিকে চার বছর আগে শরীরে পুরুষ হরমোন বেশি থাকার দায়ে মেয়ে প্রতিযোগী হিসেবে মানতে চায়নি জাতীয় অ্যাথেলিট সংস্থা। কমনওয়েলথ গেমসে গ্লাসগো যাওয়ার ছাড়পত্র পায়নি সে। তবে, স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া-র তরফে ড. পায়েমণি মিত্রকে দ্যুতিকে সবরকম সহযোগিতার জন্য নিয়োগ করা হয়। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, অবহেলা জয় করে ইন্টারন্যাশেনাল অ্যাথেলিট ফেডারেশনের সঙ্গে আপিল অবধি লড়ে জয়ী হয় দ্যুতিচাঁদ। সে একটি কথাই বলেছিল, সে যা হয়ে জন্মেছে সেই পরিচয়েই নামবে। নামলও তাই। ১০০ ও ২০০ মিটারে এশিয়ার দ্বিতীয় দ্রুততম মেয়ে দৌড় বীরের শিরোপা পেল সে। যা আজ অবধি ভারতের কোনো ক্রীড়াবিদ পায়নি। রুপোর মেয়ে দ্যুতিচাঁদের দ্যুতি জাকার্তার প্রান্তর ছাড়িয়ে আগামী দিনের বহু উঠতি ক্রীড়াবিদের অনুশীলন পথে প্রতিজ্ঞার দ্যুতি যে ছড়াবে এমনটা ভাবাই যায়। এমন সব রোমাঞ্চকর পূর্বকথা অনুক্ত রেখেই শেষ করতে হলো। তাই বাদ রইলেন অসমের সোনালি মেয়ে হিমা দাসের মতো অনেকেই।



ফঃ ৬

আন্তর্জাতিকতার আর এক নাম পঙ্কজ আদবানী

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক জীবনে ১৭ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। এহেন অত্যাশ্চর্য কীর্তির অধিকারী যিনি মাত্র বাইশ বছর বয়সেই তার সম্পর্কে বোধহয় কোনো বিশেষণই যথেষ্ট নয়। পঙ্কজ আদবানী যেন জীবনের চেয়েও বড় এক 'সুপার আইকন' এবারের প্রতিবেদনে এই আন্তর্জাতিকতাবাদে উত্তীর্ণ মানুষটি অকপটে তার মনলোকটি উন্মোচন করেছেন।

□ এত খেলা থাকতে 'কিউ' গেমসে কীভাবে এলেন?

পঙ্কজ : আমার বাবার চাকরি সূত্রে শৈশবটা কেটেছে কুয়েতে। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশটি অত্যন্ত ধনী আর তাই সেখানে বিলিয়ার্ডস, স্নুকারের চূড়ান্ত রমরমা ছিল, এখনো আছে। কিন্তু হঠাৎই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বাবার মৃত্যু হওয়ায় চলে আসি স্বদেশে। বেঙ্গালুরুতে আমার পারিবারিক বন্ধন। সেখানে ফ্রাঙ্ক অ্যান্থনি স্কুলে ভর্তি হই। স্কুলে খেলাটির ভাল পরিবেশ ও পরিকাঠামো ছিল। কুয়েতে যে প্রেমের জন্ম হয়েছিল তার অঙ্কুরোদগোম হয় মিশনারি স্কুলে এসে। আর দাদা শ্রী আদবানী ভালো খেলতেন। আমাকে এক ক্লাবে নিয়ে যান। ক্লাবে গিয়ে একদিন স্থানীয় এক বড় খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিলাম মাত্র ১০ বছরেই। এই ঘটনায় যথেষ্ট আলোড়ন পড়ে যায়। ক্লাবের কোচ দাদাকে বলেন পঙ্কজ কিন্তু লম্বা রেসের খেয়া। আমাকে 'কিউ' গেমসে নিরন্তর উৎসাহ ও সুযোগ সুবিধে প্রদান করার কথা বলেন। আর আমিও সেদিন ঠিক কবি যদি সময় ও সুযোগ পাই তাহলে এই 'কিউ গেমেই' আমি কেউকেটা হয়ে দেখিয়ে দেব সমাজকে।

□ রাজ্য ও জাতীয় স্তরে ধাপে ধাপে উত্তরণ পর্বটি বলুন?

পঙ্কজ : ১৯৯৭ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে জাতীয় জুনিয়র স্নুকারে চ্যাম্পিয়ন হই। সে বছর থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত প্রতিটি জুনিয়র বিলিয়ার্ডস ও স্নুকারে জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টে একাধিপত্য ছিল আমার। আর ২০০৩ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে সিনিয়র পর্যায়ে ভারত সেরা



হই। তখন গীত শেঠীর যুগ। দেশে-বিদেশে গীত শেঠী সব টুর্নামেন্টে জিতে চলেছেন। গীতও স্বীকার করেন আমার প্রথম সিনিয়র জাতীয় খেতাব জেতার পর তার উত্তরাধিকারী হিসেবে উঠে আসছে পঙ্কজ আদবানী। সব মিলিয়ে ২০০৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে স্নুকার ও বিলিয়ার্ড মিলিয়ে ৩০টি খেতাব জিতেছি। মাইকেল ফেরেরা অরবিন্দ সাভুর, গীত শেঠী সবার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছি।

□ বিশ্ব খেতাব জেতার ব্যাপারেও কিংবদন্তীর অনুভূতি?

পঙ্কজ : আমার টার্গেট ছিল পিটার গিলক্রিস্ট, মার্চ রাসেলের মতো লিভিং লিজেন্ডদের সঙ্গে একাসনে বসা। এই লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছি। টাইম ও পয়েন্ট ফর্মাট দু'ধরনের ফর্মাটেই ১১ বার বিশ্বখেতাব জিতেছি। ২০১৪ সালে ওয়ার্ল্ড টিম বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়ে জয়যুক্ত হয়েছিলাম। আর স্নুকারের বিশ্ব খেতাব পেয়েছি পাঁচবার। পেশাদার ও অপেশাদার বিভাগে সব মিলিয়ে দু'ধরনের কিউ গেমে ১৬টি ব্যক্তিগত একটি দলগত বিশ্ব খেতাব জিতে আমার দুই আরাধ্য তারকাকে অতিক্রম করে নিজেকে কিংবদন্তীর পর্যায়ে নিয়ে গেছি। এছাড়া এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ও এশিয়ান গেমস ধরে আরো কয়েকটি খেতাব আমার ট্রফি ক্যাবিনেটে শোভা পাচ্ছে। এই সব কীর্তি গরিমা যদি ভাবীকালকে প্রেরণা দেয় তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে।

□ ভারতের 'কিউ গেম' ঐতিহ্যের ভবিষ্যৎ কী?

পঙ্কজ : সেই ১৯৯৮ থেকে ভারতীয়রা বিশ্বব্রতে ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে। সাফল্যের এই বিরামহীন পরিক্রমা কোনোদিন শেষ হবার নয়। প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন উইলসন জোন্স। তারপর মাইকেল ফেরেরা, অরবিন্দ সাভুর, মনোজ কোঠারি, গীত শেঠী হয়ে পঙ্কজ আদবানী... সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। আমার মনে হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের অভিজ্ঞান হিসেবে যে কটি খেলাকে ধরা হয় তার অন্যতম হলো বিলিয়ার্ড ও স্নুকার। এই খেলাটিতে ব্রিটিশ আভিজাত্যের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে এক ধরনের আত্মশ্লাঘা বোধ হয়। তাই বোধহয় যুগে যুগে সব ভারতীয় খেলোয়াড় ব্রিটিশ উপনিবেশে তা সে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস বা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এই সব দেশের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে নিজেদের ছাপিয়ে গিয়ে পারফর্ম করে। শ্বেতাঙ্গ দুনিয়ার বিরুদ্ধে আত্ম-সত্ত্ব গরিমা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হন বিলিয়ার্ড ও স্নুকার। শুধু বিবেকের তাড়নাতেই নয়, এই ধরনের 'কিউ গেমে' ভারতীয়দের সহজাত দক্ষতা প্রশ্নাতীত। যা অনেকটা দাবার মতো। বুদ্ধি মেধা, সৃজনশীল উৎকর্ষ, শৈখিক কৃতকৌশল সব কিছুর চূড়ান্ত প্রয়োগ দেখা যায় এই খেলায়। ভারতীয়রা 'ফিজিকাল পাওয়ার' গেমে এঁটে উঠতে পারে না ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে কিন্তু 'ইন্টেলেকচুয়াল' সব গেমে যথেষ্ট প্রাধান্য নিয়ে খেলে, পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে। তাই মনে হয় বিশ্ব স্তরে 'কিউ গেমে' ভারতের ঐতিহ্য ও গৌরব সুরক্ষিত থাকবে সব সময়।

বিশেষ আবেদন

সমাজসেবা ও ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করতে আগ্রহীদের এগিয়ে আসার আবেদন জানানো হচ্ছে। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে যাঁরা এই কাজ করতে আগ্রহী তাঁরা যোগাযোগ করুন—

মানব সেবা প্রতিষ্ঠান

৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার,

(মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজের কাছে), কলকাতা

ফোন নং - ৯৯৩৩১৫০০৩৭

শোক সংবাদ

মালদহ জেলার গাজোল খণ্ডের বারকোনা শাখার স্বয়ংসেবক ক্ষুদিরাম আর্য গত ১

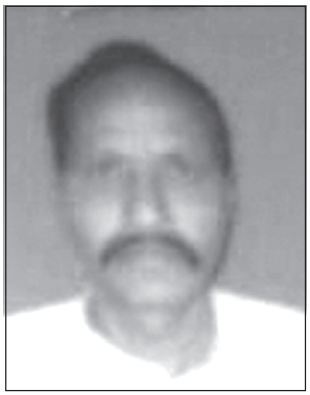

সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির দায়িত্ব পালন করছিলেন।

* * *

মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক, বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর নগর সঙ্ঘচালক অমিত চৌধুরীর মাতৃদেবী মণিকা চৌধুরী গত



১৯ সেপ্টেম্বর মালদা মকদুমপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ১ পুত্র,৬ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বীরভূম জেলার নলহাটি নগরের কলেজ ছাত্র প্রমুখ সুজিত মণ্ডল গত ২২ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র ও ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর বিজয়গড় প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক তপন ঘটকের মাতৃদেবী আশারানি ঘটক গত ৩ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স



হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ১ কন্যা ও নতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলি শাখার স্বয়ংসেবক শুভঙ্কর মণ্ডল ও সহ জেলা কার্যবাহ তারাশঙ্কর মণ্ডলের পিতৃদেব মিথিলানাথ মণ্ডল গত ১৩ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

হাওড়া জেলার সন্ত স্বামীজী শাখার স্বয়ংসেবক সমীর বারিক ও বাবলু বারিকের মাতৃদেবী রঞ্জিতা বারিক গত ১৩ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি ৭ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংস্কার ভারতীর সম্পাদক, রায়গঞ্জ তুলসীপাড়া সেবক পল্লী নিবাসী বিকাশ ভৌমিকের পিতৃদেব অনন্ত কুমার

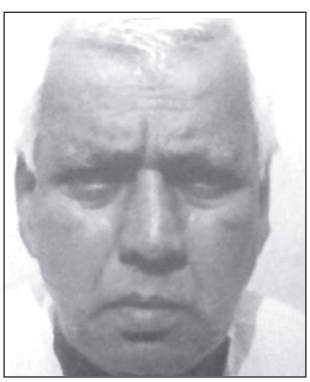

ভৌমিক গত ২৩ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বসিরহাট জেলার প্রাক্তন জেলা সভাপতি কিশোরীমোহন ঘোষ



গত ৩০ আগস্ট পরলোকগমন করেন। তিনি ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা সল্টলেকের স্বয়ংসেবক, সহকার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সহ সভাপতি প্রবীর ঘোষালের মাতৃদেবী দীনাশ্রী ঘোষাল গত ১১ সেপ্টেম্বর করুণাময়ীর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ হছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা দক্ষিণ বিভাগের শ্যামাপ্রসাদ নগরের পূর্বতন নগর সঙ্ঘচালক বিহারীলাল



চক্রবর্তী গত ১৪ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার গোলাপগঞ্জের চরিঅনন্তপুর ভীমটোলা শাখার স্বয়ংসেবক ষষ্ঠীচরণ রাহা গত ২৩ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, এলাকায় তাঁর হাতেই সঙ্ঘের শাখা শুরু হয়।

দাড়িভিটে গুলিচালনার প্রতিবাদসভা

শিলিগুড়িতে বিদ্যার্থী পরিষদের ওপর হামলা তৃণমূলিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৫ অক্টোবর শিলিগুড়িতে ইসলামপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিদ্যার্থী পরিষদের ডাকা কার্যক্রমে তাণ্ডব চালাল একদল তৃণমূলি দুষ্কৃতী। পুলিশের ভূমিকা নীরব দর্শকের, কোথাও পুলিশই



প্রচ্ছন্ন মদতদাতা। ইসলামপুরে গুলিচালনা কাণ্ডে দুই ছাত্রের মৃত্যুর প্রতিবাদে ওইদিন দুপুরে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে ছাত্র-সমাবেশের পর পানিটাঙ্কি মোড় পর্যন্ত মিছিলের পরিকল্পনা ছিল বিদ্যার্থী পরিষদের। ছাত্র-সংগঠনটির অভিযোগ, সাতদিন ধরে তারা পুলিশের কাছে এনিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতির জন্য আবেদন জানালে নানা অছিলায় তা বাতিল করবার চেষ্টা হয়। প্রথমে বলা মুখ্যমন্ত্রী ওই সময় শহরে থাকবেন তাই অনুমতি দেওয়া যাবে না। পরে পরিষদের কার্যকর্তারা মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচি দেখে পুলিশের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে বলেন ওই সময় মুখ্যমন্ত্রী তো শহরেই থাকছেন না।

সুর পাল্টে পুলিশ অজুহাত দেয়, ওইদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পূর্বনির্ধারিত মিছিলের জন্য পরিষদকে অনুমতি দেওয়া যাবে না। যদিও এ ব্যাপারে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনকে দেওয়া প্রয়োজনীয় অনুমতি- পত্র শিলিগুড়ি কমিশনারেটের পুলিশ দেখাতে পারেনি। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা কার্যক্রমে যোগদান করতে বাসভাড়া করে আসার সময় কোচবিহার, মাথাভাঙা, তুফানগঞ্জ, মালদা সহ বিভিন্ন জায়গায় বাস আটকে পরিষদ কর্মীদের ওপর হামলা চালায় তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী। পুলিশও কোনও অভিযোগ শুনতে চায়নি। পরিস্থিতি চরমে ওঠে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। দুপুর নাগাদ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পরিষদের কার্যকর্তারা জড়ো হয়েছিলেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। স্টেশন চত্বরেই তাদের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালায় তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনি। লাঠি দিয়ে, বেল্ট খুলে পরিষদ-কর্মীদের বেধড়ক প্রহার করা হয়। মহিলারাও বাদ যাননি। ঘটনায় অন্তত ৩০ জন গুরুতর জখম হন বলে সূত্রের খবর। এই হামলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অন্য যাত্রীরাও। গোটা ঘটনায় ক্ষুব্ধ রেল আর পি এফের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। পরিষদের এই কর্মীদের একপ্রকার অবরুদ্ধ করে রাখা হয় স্টেশন চত্বরে।

গোটা শিলিগুড়ি জুড়ে তাণ্ডব চালিয়েও অবশ্য পরিষদের প্রতিবাদ আন্দোলন থামাতে পারেনি তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সমাবেশে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে এসেছিলেন ইসলামপুরের স্কুলে গুলি চালনায় নিহত রাজের সরকারের মা ঝরনা সরকার, নিহত তাপস বর্মনের বোন রূপা বর্মন, গুলিতে জখম বিপ্লব সরকারের মা সরস্বতী সরকার। ঝরনাদেবী বলেন— 'ছেলেকে তো আর ফিরে পাব না। কিন্তু আর কোনও মায়ের বুক যাতে না খালি হয়, তার জন্য বিচার চাই। পুলিশই গুলি চালিয়েছে, তাই সি আই ডি-র ওপর ভরসা নেই, সি বি আই তদন্ত দাবি করছি।' পরিষদের সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক সুনীল আম্বেকর বলেন দাড়িভিটের পাশে সারা দেশের ছাত্র-সমাজ দাঁড়াতে প্রস্তুত। সমাবেশে পরিষদের যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক কে এন রঘুনন্দনও ভাষণ রাখেন।

পরিষদের রাজ্য সম্পাদক সপ্তর্ষি সরকার মনে করিয়ে দেন নন্দী গ্রামে গুলিচালনা যেমন বাম-শাসনকে রাজ্যছাড়া করেছিল, তৃণমূলের ভাগ্যেও তেমনি দাড়িভিট লেখা হয়ে গিয়েছে। যুগ্ম-সম্পাদক আনন্দময় চক্রবর্তীর বক্তব্য, ইমামরা বিনা অনুমতি সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে কলকাতায় মিছিল করতে পারে, আর পরিষদ রাজ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় শিলিগুড়িতে মিছিল করতে চেয়ে সাতদিন ধরে আবেদন করলেও তা মঞ্জুর হয় না।

তৃণমূল স্পনসর্ড দলিত-মুসলিম লং মার্চ

সংবাদদাতা।। গত ৩০ সেপ্টেম্বর রবিবার আলিপুর দুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি থেকে অসম পর্যন্ত এন আর সি-র বিরুদ্ধে লং মার্চের ঘোষণা করেছিল অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের দুই-তিন জন ব্যক্তি। তারা বেশ কিছুদিন ধরে চষে বেড়িয়েছে উত্তরবঙ্গের নমঃশূদ্র অধ্যুষিত জনবসতিগুলি। ওদের সঙ্গে ছিল, বামসেফের (BAMCEF) নেতা পরিচয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকজন। সূত্র বলছে, গত ২৩ সেপ্টেম্বর আলিপুর জেলার ফালাকাটায় এক ঘরোয়া বৈঠকে বামশেফ নেতা কামাল আনসারির বক্তব্য ছিল বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে তারা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। এখনো সেই অত্যাচারের ধারা চলছে। এখন দলিত-নমঃশূদ্র-মুসলমান সবাই একসঙ্গে আন্দোলন করতে হবে। অর্থাৎ অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের ব্যানারে হলেও এটি আসলে ছিল তথাকথিত দলিত-মুসলমান সমন্বয়ে গঠিত নাগরিক মঞ্চের যৌথ কর্মসূচি।

এই কর্মসূচির আয়োজনের ধরন অনেকটা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে ভীমা-কোরেগাঁওয়ে আয়োজিত দলিত সমাবেশের সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। অমিল শুধু একটি জায়গাতে। ভীমা-কোরেগাঁওয়ের উদ্দেশ্য ছিল দলিত সমাবেশের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার উভয়কে দলিত বিরোধী হিসেবে তুলে ধরা। আর এই লং মার্চের উদ্দেশ্য ছিল মমতা নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারের সহায়তায় দলিত-মুসলমান লং মার্চ করে অসমে ঢুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অসম ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দলিত-মুসলমান বিরোধী হিসেবে তুলে ধরা। সভায় খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে মানুষের যাতায়াতের জন্য যানবাহনের অভাব ছিল না। আলপিুরদুয়ারের সাংসদ দশরথ তিরকি, জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজয় চন্দ্র বর্মন, আলিপুরের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর মতো বড়মাপের তৃণমূল নেতারা দাঁড়িয়ে থেকে কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা দেখেছেন। ঘোষণা ছিল অসমের এন আর সি-র বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে কম করে ৩০ হাজার মানুষ। প্রচুর টাকা পয়সা ছড়িয়ে শেষে বড় জোর হাজার দু'ই মানুষ জমায়েত করতে পরেছিলেন। অসম সীমান্তে কঠোর পুলিশি ব্যবস্থার কথা শোনার পর শত প্ররোচনা সত্ত্বেও মানুষ কিন্তু এগোতে সাহস করেনি। সূত্রে প্রকাশ, সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর মোবাইলে ৯ মিনিট ধরে ভাষণ দিয়ে নমঃশূদ্রদের আন্দোলনের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়াতে এটা স্পষ্ট যে কর্মসূচিটি অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের ব্যানারে দলিত-মুসলমান সমাবেশের নামে তৃণমূল কংগ্রেসেরই কর্মসূচি। কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে কয়েক জনের প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। তাদের বক্তব্য হলো, ভুল বুঝিয়ে তাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল নাগরিকত্বের দাবিতে কোনো কর্মসূচি পালিত হবে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল স্বাধীনতার সত্তর বছর পর বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য কেন্দ্র যে বিল এনেছে মমতা ব্যানার্জি কেন সেই 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬'-এর তীব্র বিরোধিতা করছেন সে নিয়ে একটি বাক্যও উচ্চারিত হলো না। উদ্বাস্তু শ্রেণীর যাঁরা এই কর্মসূচিতে এসেছিলেন তাদের অনেকেই প্রতারিত হয়েছেন এমন কথাও উঠে এসেছে। কারণ নাগরিকত্বের নামে সমাবেশ করে বিজেপি বিরোধী কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ানোর কৌশল অনেকেই মেনে নিতে পারেননি।



হরিয়ানায় কৃষকনেতা চৌধরী ছোটুরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'চৌধরী ছোটুরাম ছিলেন হরিয়ানার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতা। তিনি কৃষক, শ্রমিক এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করেছিলেন।' সম্প্রতি হরিয়ানার রোহ্তকে চৌধরী ছোটুরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রোহ্তকের বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কৃষকদের নেতা, জাঠ সম্প্রদায়ের দূত, রাহ্বার-ই-আজম দীনবন্ধু চৌধরী ছোটুরামজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছি তার জন্য আমি নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে চাই।' স্যার ছোটুরামজীর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছোটুরামজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই লড়াইয়েও তিনি কৃষকদের কথা তুলে ধরেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে দেশের কয়েকটি জায়গায় কৃষক-অসন্তোষের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের উন্নয়নের জন্য নানারকম কাজ করে চলেছে। যার মধ্যে প্রধান হলো কৃষিপণ্য বিপণনের জন্য দেশে একটি বিশ্বমানের বাজার তৈরি করা। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশের মানুষকে ছোটুরামজীর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। আজকের প্রজন্ম জানেই না, চৌধরী ছোটুরামজী কৃষিপণ্য বাজার আইন প্রণয়ন করেছিলেন। যার উদ্দেশ্য ছিল কৃষককে তার উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য মূল্য প্রদান করা। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী-আশা যোজনার কথা মনে করিয়ে দেন। উল্লেখ্য, এই যোজনায় কোনও কৃষক যদি প্রাকৃতিক বা অন্য কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন কিংবা ফসলের দাম ঠিকমতো না পান তাহলে কেন্দ্র পরিপূরক মূল্য প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। এদিন প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য হরিয়ানা সরকারকে ধন্যবাদ জানান। রাজ্য সরকারের সক্রিয়তায় মাত্র দু' সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধে গ্রহণ করেছেন। এছাড়া এদিন প্রধানমন্ত্রী সোনপতে একটি রেলের কোচ তৈরির কারখানার শিলান্যাস করেন।

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপির কাছে গোহারা বাম-মাওবাদীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্দান্ত নির্বাচনী সাফল্য পেল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বামেদের পর্যুদস্ত করে ছ'টি পদের মধ্যে ছ'টিতেই জিতল এবিভিপি। শেষবার ২০০৯ সালে পাঁচটি পদে জয়ী হয়েছিল বিদ্যার্থী পরিষদ। এস এফ আই-এর এরাম নবীন কুমারকে হারিয়ে ৩৩৪ ভোটে জয়ী হন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার বিদ্যার্থী পরিষদের আরতি নাগপাল। এছাড়াও সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদেও যথাক্রমে পরিষদের অমিত কুমার, ধীরাজ সংযোজি, প্রবীণ চৌহ্বান, অরবিন্দ এস কুমার ও নিখিল রাজ জয়ী হন বাম প্রার্থীদের (যাদের মধ্যে সিপিএমের ছাত্র-সংগঠন এস এফ আই-এর সঙ্গে নকশালপন্থী আইসাও ছিল) হারিয়ে।

প্রসঙ্গত, বাংলার একটি বিশেষ নকশালপন্থী সংবাদমাধ্যম এবারে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার্থী পরিষদের বিপুল নির্বাচনী সাফল্যকে আড়াল করতে জে এন ইউ-এর ফলাফল ও কিছু অপপ্রচারকে হাতিয়ার করেছিল। জে এন ইউ-এর মতো হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ও এতকাল নকশালদের গড় হিসাবে সুপরিচিত ছিল। এখানে নকশাল ও মাওবাদীরা গোহারা হতেই প্রচারমাধ্যমটির মুখ শুকিয়ে যায়। ভেতরে কোনও ক্রমে চার-ছ'লাইনের একটি খবর দিয়েই মুখরক্ষার চেষ্টা করে তারা।

গুজরাটে বিভেদকামী শক্তিকে মাথা তুলতে দেওয়া হবে না : বিজয় রুপানি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানি সম্প্রতি রাজ্যে মাথাচাড়া দেওয়া বিভেদকামী শক্তিকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, কর্মসূত্রে গুজরাটে আসা বিহার উত্তরপ্রদেশের শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর যারা অত্যাচার করছেন, গুজরাট ছেড়ে যেতে বাধ্য করছেন, কড়া হাতে তাদের মোকাবিলা করবে রাজ্য সরকার। অন্য রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, গুজরাট এবং গুজরাটিদের বৈশিষ্ট্যই হলো অন্য রাজ্যের মানুষকে আপন করে নেওয়া। গুজরাটিরা সবাইকে নিয়ে ঘরোয়া পরিবেশে শান্তিতে থাকতে চান। গুজরাটিদের এই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য তিনি রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে আহ্বান জানান। এরপর তিনি বিভেদকামী রাজনীতিতে ইন্ধন জোগানোর জন্য কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর নাম করে তিনি বলেন, কংগ্রেস যদি গুজরাটের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরোধীই হয় তা হলে কংগ্রেস সভাপতির উচিত তার নিজের দলেরই কয়েকজন সদস্যের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কংগ্রেস বিধায়ক অল্পেশ ঠাকুরকে সম্প্রতি 'হেট ক্যাম্পেনে' অংশ নিতে দেখা গেছে।

রাজ্যের মুখ্যসচিব জে. এন. সিংহ কালেক্টর এবং এসপিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। রাজ্যের সর্বত্র আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কড়া হতে বলা হয়েছে পুলিশকে। অন্য রাজ্যের মানুষের ওপর এখনও পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ৫৪টি হামলার অভিযোগে পুলিশ মোট ৪৩১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

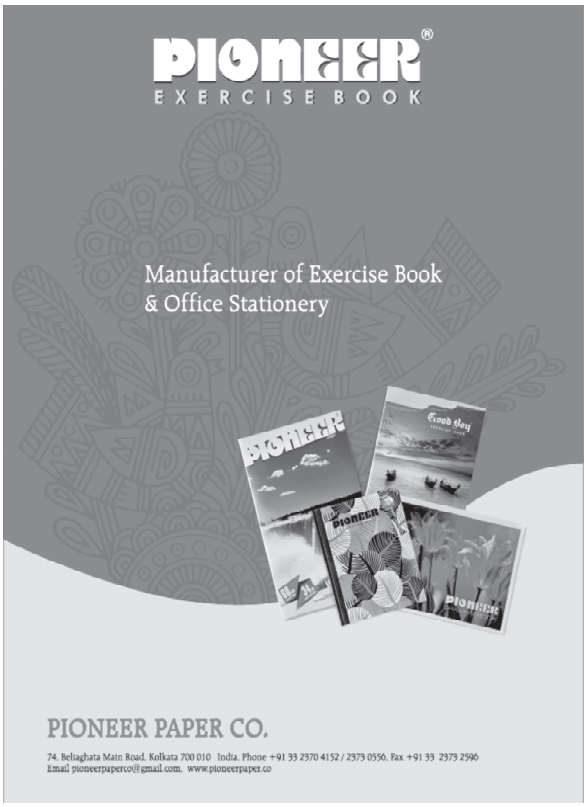

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

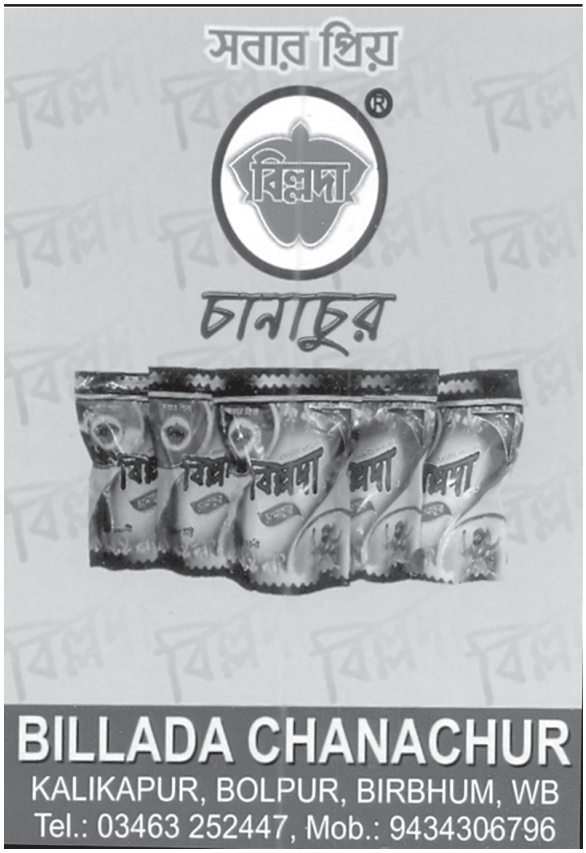

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

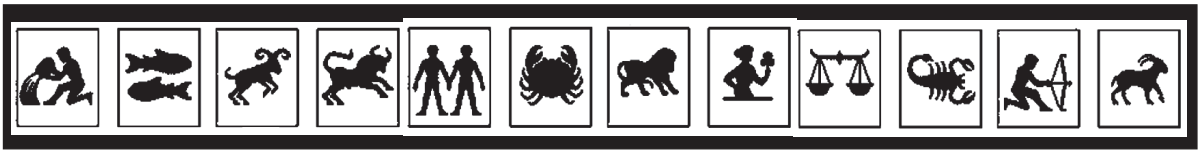

১৫ অক্টোবর (সোমবার) থেকে ২১ অক্টোবর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, কন্যায় রবি, তুলায় বুধ-শুক্র, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, মকরে মঙ্গল-কেতু। বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় রবির তুলায় প্রবেশ।

মেষ : এই সপ্তাহে কর্মসংক্রান্ত উদ্যোগ ও সাফল্য। প্রমোটার, শল্য চিকিৎসক ও পিতার সার্বিক শুভ। পোশাক, বিলাসিতা ও রমণীর সান্নিধ্যে আনন্দ। অতিথি আপ্যায়ন ও প্রিয়বাক্যে জনপ্রিয়তা, শরীরের নজরদারি ও উত্তেজনাকর পরিবেশ এড়িয়ে চলুন। আয়ের সঙ্গে ভালো ব্যয় যোগ।

বৃষ : কর্মজনিত খ্যাতি, কৌশলী মন, অগ্রজের উন্নতি। ফাটকা ব্যবসায় শুভ, তবে পুরাতন ঝামেলায় কলুষিত মন। সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় যুক্তদের শংসা ও প্রতিষ্ঠা। লাইফ পার্টনারের চিকিৎসা জনিত ব্যয়। বিদ্যার্থীদের জন্য সপ্তাহটি অনুকূল নহে, ভ্রমণের সম্ভাবনা। চোট-আঘাত জনিত ক্লেশ ভোগ।

মিথুন : সৃজনশীল কাজ, দান-ধ্যান, আত্মীয় সমাগমে আনন্দঘন সপ্তাহ। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদদের সৃষ্টির প্রকাশ দূর ভ্রমণের সম্ভাবনা। যুবকবন্ধু হিতকারী। মাতার স্বাস্থ্যহানি ও সন্তান মনঃচাঞ্চল্যের কারণ। ব্যবসায় শুভ। পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্তি।

কর্কট : ভ্রমণ ও দেব-দ্বিজে ভক্তি। শারীরিক ক্লেশ ও ভ্রাতৃস্থানীয়ের ব্যবহারে হতাশা। শৌখিন, রুচিসম্মত পোশাক ও খাদ্যগ্রহণ। সপ্তাহের শেষভাগে ব্যস্ততা, দাম্পত্য কলহ ও অপ্রত্যাশিত মানসিক অশান্তি। বাতজ-বেদনায় অস্বস্তি।

সিংহ : এ সপ্তাহে কর্মে সতর্কতা প্রয়োজন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হঠাৎ চোট-আঘাত ও কথাবার্তায় সংযতভাব দরকরার। গৃহ ও জমি সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর ব্যস্ততা ও অমনোযোগিতা পরিলক্ষিত হয়।

কন্যা : শরীরের যত্নের প্রয়োজন। বুদ্ধিভ্রংশতায় বহু বাধার সম্মুখীন হতে হবে। স্বজন সম্পর্কে উন্নতি, সন্তানের সাফল্য ও লাইফ পার্টনারের দূরদৃষ্টিতে পারিবারিক স্বস্তি। প্রেমিক-প্রেমিকার শুভ সপ্তাহ। হৃদযন্ত্রের পীড়া ও রক্তচাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

তুলা : ভ্রাতৃস্থানীয় প্রতিবেশী ও দুর্বল শ্রেণীর প্রতি দয়ার্দ্র হৃদয় ও মূল্যবোধের পরিসর বৃদ্ধি। শিল্পী, কলাকুশলীদের সৃষ্টির আনন্দধারায় নব নব সংযোজন। কর্মক্ষেত্রে ছলনাময়ীর রাহুগ্রাস। পরিবার পরিজন সহ তীর্থদর্শন। শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

বৃশ্চিক : চলতি সপ্তাহে আর্থিক বিষয় উৎসাহজনক। তবে মাতার স্বাস্থ্য উদ্বেগের বিষয়। দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা বিষয়ের সমাধান। জমি, বাড়ি অথবা নতুন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগে প্রাপ্তি শুভ। সন্তানের বুদ্ধিমত্তার বাস্তবায়ন ও নিজ উদ্যোগে পেশাগত স্বীকৃতি। বিশিষ্টজনের সাহচর্য-সহায়তা। জীবিকার নতুন দিশা।

ধনু : বয়স্কদের বিরাগভাজন, কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা, সমাজকল্যাণে ব্যয়, প্রিয়জনের ব্যবহারে ব্যথিত বোধ ও সন্তানের আচরণ মন চাঞ্চল্যের কারণ। উদাসীনতা, সমালোচনা, আইনি ঝামেলা ও অকারণ ভুল বোঝাবুঝি। যুক্তিসঙ্গত কথাবার্তায় শত্রুতার যোগ। সপ্তাহের শেষভাগে সুন্দর ও বর্ণময় জীবনের ঝরনাধারায় প্লাবিত জীবন।

মকর : নতুন উদ্যোগের অনুকূল পরিবেশ। বিত্ত ও অভিজাত্য গৌরব। প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাবে প্রাপ্তির ভাণ্ডার, একাধিক উপায়ে অর্থাগমের যোগ। যানবাহন ও খনিজ ব্যবসায় শুভ। বিলাস-ব্যসনে ব্যয়াধিক্য ও প্রভাবী ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে ভাব প্রবণতায় ভাল সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা।

কুম্ভ : বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ, যানবাহন ও সম্পত্তি লাভ, পরিজন-সহ তীর্থভ্রমণ, কারিগরি দক্ষতায় শংসা ও স্বীকৃতি। সাহিত্য পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণার্থে সৃষ্টির সপ্রতিভতা। শৌখিন ও বিলাসদ্রব্য ক্রয়। ভোজন, বিনিয়োগ বর্জনীয়। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ।

মীন : জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থতায় প্রতিভার স্ফুরণ ও তমসার অবসানে নব আলোকবর্তিকা। শিক্ষায় বিঘ্ন, প্রতিপক্ষের বিরূপতা, অমিতব্যয়িতার পরিচয়। সৌন্দর্য ও রমণীর সান্নিধ্যে বিহ্বল চিত্ত। সপ্তাহের শেষদিকে ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশীর কারণে মনোকষ্ট। শির ও চক্ষুপীড়া। সৃজনশীল পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, ধর্ম ও দর্শন আলোচনায় প্রশান্তি।

• জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

শ্রী আচার্য্য